প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
বেঙ্গল পাবলিশার্স,
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাকর—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মানসী প্রেস,
৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও,
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

আড়াই টাকা

কামধেনু

ওহি যে আঁতঠো, উঠো গরুকা হায়, না?—ফাঁসীর আসামী নাথু প্রশ্ন করলে ওয়ার্ডারকে। বাঙালী পটুয়ার ছেলে নাথুর হিন্দী এর চেয়ে আর কত ভাল হবে?

কেয়া?—বিস্ময়ে এবং তীব্র বিরক্তিতে দোবেজী ওয়ার্ডারের মুখের ভাব অদ্ভুত হয়ে উঠল। 'গরুকা আঁত' অর্থাৎ গরুর অন্ত্র কথাটা শোনবা মাত্র তার অন্তর থেকে দেহের সর্বাঙ্গ যেন অস্পৃশ্য বস্তুর ছোঁয়াচ অনুভব করলে।

নাথু কিন্তু গ্রাহ্য করলে না। ফাঁসির আসামী ওয়ার্ডারের বিরক্তিকে গ্রাহ্য করবে কেন? ওয়ার্ডার তাকে সেলে পুরে লোহার গরাদে দেওয়া দরজাটা বন্ধ করছিল। ভিতরের দিকে গরাদে ধ'রে নাথু ওয়ার্ডারের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কথাটা পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিলে, ওহি যো—যেঠো হামারা গলায় পরায়কে ঝুলায় দেগা, উঠো তো আঁত হায়, তা উঠো গরুকে আঁত হায়, না, আর কিছুকা হায়?

অর্থাৎ ফাঁসির আসামীর গলায় যে দড়িটা পরিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়—নাথুর ধারণা, সেটা কোন জানোয়ারের অন্ত্র থেকে তৈরি, তার প্রশ্ন হ'ল—সে অন্ত্রটা গরুর অথবা অন্য কোন জানোয়ারের? দোবে দীর্ঘ দিন বাংলার জেলখানায় ওয়ার্ডারের কাজ করছে, এ ধরনের উদ্ভট হিন্দী বুঝতে সে অনায়াসেই পারে।

দোবেজী মুখ ঘুরিয়ে বার দুয়েক থুথু ফেলে বললে, আরে না না, আঁত-টাঁত না আছে রে। ডুরি—ডুরি আছে। বহুত ফাইন ডুরি—মোম্—

মাথা নেড়ে নাথু বললে, ছুরি? দড়ি? এই দড়ি?

হাঁ, হাঁ, দড়ি—দড়ি। নাথুর মুখের দিকে চেয়ে সে থেমে গেল।

দুটো গরাদে শীর্ণ হাতের শক্ত মুঠোয় চেপে ধ'রে নাথু আকাশের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের শিরাগুলো স্ফীত হয়ে উঠেছে, মুখের দু পাশের চোয়ালের হাড় দুটো অসম্ভব রকমের উঁচু হয়ে উঠেছে, স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, জীর্ণ শরীরে সকল শক্তি প্রয়োগ ক'রে সে দাঁতে দাঁতে চেপে ধরেছে।

দোবে প্রবীণ লোক। ফাঁসির আসামীদের সম্পর্কে বহু বিচিত্র গল্প সে শুনেছে, নিজেও চোখে দেখেছে—এগারোটা ফাঁসির আসামী; নাথুকে নিয়ে হবে বারোটা। এগারোটার অভিজ্ঞতাই তার যথেষ্ট, অর্থাৎ নাথু সম্বন্ধে আর তার কোনও কৌতূহল নাই।

দরজায় তালা লাগিয়ে বার কয়েক ঝাঁকি দিয়ে টেনে দেখে নাল-মারা জুতোর শব্দ তুলে সে চ'লে গেল।

* * * *

ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পাটাতনের নীচে অন্ধকার গর্তের মধ্যে শরীরের সকল স্নায়বিক আক্ষেপ শেষ হয়ে গেলে নাথুর দেহ স্থির হয়ে যাবে, চোখে দৃষ্টি থাকবে না, আরও বিকৃতি হবে অনেক; সে দৃশ্য চোখে না দেখাই ভাল। কিন্তু এই মুহূর্তে মনহীন অথচ জীবন্ত নাথুর চেহারা দেখে শিল্পীর লোভ হবে ছবি আঁকতে; যোগপন্থী সন্ন্যাসী বিস্মিত হয়ে ভাববে, খুনী লোকটা পেলে কোন্ পুণ্যে এই বস্তু! নাথুর দেহ থেকে মন বেরিয়ে চ'লে গিয়েছে। বাইরের প্রত্যক্ষ পারিপার্শ্বিক সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে মনোলোকের গভীরে অন্ধকার অবচেতনে প্রবেশ করেছে—এ কথা বললে তর্ক তুলব না; কিন্তু সবিনয়ে বলব, আমার বিশ্বাস সেলের মধ্যে আবদ্ধ নাথুর মন ইট কাঠ লোহার স্থূল কঠিন নিশ্ছিদ্র অবস্থানকে অতিক্রম ক'রে লাল মাটির পাকা সড়ক ধ'রে চ'লে যাচ্ছে—এ আমি দেখতে পাচ্ছি।

লাল মাটির সড়কের দু পাশে ঘন সারিবদ্ধ গাছ, মধ্যে মধ্যে বড় বড় গ্রাম; বাজার, পাকাবাড়ি দালান কোঠা, গ্রাম শেষে আসে মাঁঠ ; মাঠের বুক চিরে মেটে রাস্তা, তেমনই একটি মেটে রাস্তা ধ'রে চলেছে তার মন। মেটে রাস্তার আশেপাশে ছোট ছোট গ্রাম, খ'ড়ো বাড়ি, বাঁশবন, ডোবা, আম-কাঁঠাল-শিরীষগাছের বাগান ঘেরা মরা দিঘি, মধ্যে মধ্যে আকাশ-ছোঁয়া অশ্বত্থগাছ, বিরাট ছাতার মত বটগাছ, সারিবন্দী তালগাছ, প'ড়ো ভিটাতে খেজুরগাছ, বড় বড় গাছের তলায় চাপ বেঁধে ধাবুরি, মানে—বনতুলসীর জঙ্গল, নয়নতারা ফুলের গাছ, কালুকাঁটার বন, ম্যালেরিয়াগাছের জঙ্গল চ'লে গিয়েছে গ্রামের এ মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত। মধ্যে মধ্যে বড় বড় গাছগুলোর এক-একটার মাথায় আলোকলতা, তলায় ছোট গাছের জঙ্গলের মধ্যে লতিয়ে বেড়ায় বিছিতি-লতা। এ সব হ'ল চাষী-সদ্‌গোপের গ্রাম। সে গ্রাম পার হয়ে ওই মেটে পথ থেকে মন তার পথ ধরে—আঁকা বাঁকা আলপথে-পথে। মাঠের মধ্যে, ছোট একটা 'কাঁদর' অর্থাৎ ছোট গেঁয়ো নদী বা বড় নালা; সে নালার দু ধারে ঘন অর্জুনগাছের জঙ্গল; নালার উপরে বাঁশের সাঁকো। সে সাঁকো পেরিয়ে ছোট একখানি গ্রাম, কুড়ি-পঁচিশ ঘর পটুয়ার বাস। লোকে সকালে 'দুর্গা দুর্গা' 'হরি হরি' ব'লে ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে মুখে হাতে জল দিয়ে আল্লাতায়লাকে ডাকে, রসুল আল্লাকে স্মরণ করে। কেউ গৌরাঙ্গের নাম নিয়ে খঞ্জনি পট নিয়ে গ্রামান্তরে বার হয়, কেউ শুধু খঞ্জনি নিয়ে শিবদুর্গার নাম নিয়ে বার হয়, কেউ গো-মাতা সুরভির নাম নিয়ে বার হয়।

"সুরভিমঙ্গল গান গোধন-মহিমা
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণে দিতে নারে সীমা।
লোমকূপে কূপে মায়ের দেবতারই বাস
যে সেবে গো-মাতা তার পূরে সর্ব আশ।"

তালে তালে হাতের মন্দিরা বাজে ঠুন্-ঠুন্ ঠুমু-ঝুন্; ঠুন্-ঠুন্ ঠুমু-ঝুন্;
ঠুমু-ঝুন্, ঠুমু-ঝুন্; ঠুমু-ঠুমু ঠুমু-ঝুন।

নবলক্ষ গাভীর পাল ছিল এক গৃহস্থের। ঘরের কর্তাবুড়ো সকালে গোয়ালের দরজায় প্রণাম ক'রে দরজা খুলত। বড় বউ করত গোয়াল পরিষ্কার। বড় ছেলে দিত খেতে। মেজ ছেলে দুইত দুধ। ছোট ছেলে নিয়ে যেত মাঠে। নবলক্ষ গাভী খুঁটে খুঁটে কচি ঘাস খেত, সে চারিদিকে পাহারা দিয়ে ফিরত; কোথায় আসছে সাপ, কোথায় উঁকি মারছে 'হুড়ার'। তার হাতে থাকত লাঠি, কোমরে গোঁজা থাকত বাঁশী। সন্ধ্যায় নবলক্ষ গাভী এসে দাঁড়াত গোয়ালের সামনে। এবার সেবার পালা পড়ত বাড়ির বুড়ী-গিন্নী [illegible] ছেলেদের মায়ের; প্রতিটি গাইয়ের ক্ষুরে জল দিত, শিঙে তেল দিত [illegible] পালে দিত হলুদ আর সিঁদুর। তাদের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে মা-সুরভি [illegible] দিলেন নিজের মেয়ে নন্দিনীর এক মেয়েকে। 'কামধেনু'।

দেখলেই মনে হয়, আশ্বিন মাসের আকাশের [illegible] মেঘের মত নরম আর সাদা ওই বকনা বাছুরটি। দেখলে চোখ জুড়ি[illegible]য়; গায়ে হাত দিলে মনে হয়, কোন কচি দেবকন্যার অঙ্গে বা [illegible] পড়ল। হাতের নীচে কামধেনুর অঙ্গখানি শিউরে শিউরে ওঠে। [illegible]র ক্ষুর পরিষ্কার করতে বসলে মাথার চুল চেটে আশীর্বাদ করে, [illegible]-ভরা পিঠ চেটে আদর করে। সাধারণ গরু পিঠ চাটে ঘামের [illegible]। আস্বাদের জন্য; কামধেনুর সম্পর্কে ও-কথা বলা চলে না। নইলে সে যখন যুবতী হয়ে ওঠে, সর্বাঙ্গ ভ'রে ওঠে পুষ্টিতে, চিক্কনতর লোমে, গলার গলকম্বল প্রশস্ত হয়ে ঝুলে পড়ে, মন মোহিত ক'রে দুলতে থাকে, পিছন দিকটি ক্রমশ ভারী হয়ে উঠে থমকে থমকে চলে, অথচ সন্তানপ্রসবের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। গৃহস্থ যখন বন্ধ্যা গাই ব'লে বিরক্ত হয়ে ওঠে, তখন একদিন বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যে কামধেনুর মহিমা প্রকাশ পায়।

সন্তান প্রসব করে না, অথচ প্রবালের মত রক্তিম আভায় এবং এক রাশি পদ্মফুলের মত পেলবতায় অপরূপ লাবণ্যে মণ্ডিত হয়ে তার স্তনভাণ্ড স্ফীত হয়ে ওঠে, পাকা বিল্বফলের মত পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে স্তনবৃন্তগুলি; প্রথমে বিন্দু বিন্দু দুধ দেখা দেয় স্তনবৃন্তের মুখে; তারপর ফোঁটা ফোঁটা ঝ'রে পড়ে মাটিতে; কামধেনু সাড়া দেয়, ডাকতে থাকে; যেমন সন্তানবতী গাভীর স্তনে দুধ জ'মে উঠলে সে সন্তানকে ডাকে তেমনই ভাবে ডাকে কামধেনু, ডাকে গৃহস্থকে, বলে—আমার সুধায় তোর ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটুক, তোর সন্তান দুধে-ভাতে থাকুক, নে, পাত্র এনে আমার সুধা সংগ্রহ ক'রে নে। এতেও যদি গৃহস্থ বুঝতে না পারে, তবে কামধেনু তখন ব'সে পড়ে; স্তনের উপর দেহের চাপ দিয়ে অনর্গল সুধা ক্ষরিত ক'রে দেখিয়ে দেয়।

বহু পুরুষের পুণ্যফল, বহু জন্মের সংকর্মের সৌভাগ্য। পটুয়ার ঘরে 'কামধেনু' একদিন ঠিক এইভাবেই আত্মপ্রকাশ করলেন। পুরুষানুক্রমে তারা 'সুরভিমঙ্গল' গান গেয়ে গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে গো-মাতার মহিমা প্রচার ক'রে আসছে; কত পুরুষ তার সঠিক হিসেব নাই, তবে বাপের বাপ কর্তাবাপকে বুড়ো অবস্থাতেও দেখেছিল নাথু, তারই কাছে তার গানশিক্ষার হাতেখড়ি, বাপের সঙ্গে এক সঙ্গে ভিক্ষায় বেরিয়েছে, তার গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান করেছে; নিজেও এই গান গাইছে। বহু পুরুষের সেবার পুণ্যফলের হিসেব, জমা-খরচের অঙ্কের মত ওর প্রমাণ-প্রয়োগ লাগে না, কিন্তু বহু জন্মের সং-কর্মের ভাগ্যের কোন লিখিত-পঠিত দলিল নাই। আর গাছের চারা দেখে যেমন মাটির তলার অদেখা বীজটির আকার প্রকার গুণাগুণ অনুমান করতে কষ্ট হয় না, তেমনই ধারায় কামধেনুর আবির্ভাবে পূর্বজন্মের সুকৃতিকেও সহজেই মেনে নিয়েছিল নাথু। এ জন্মের পুণ্যও আছে। নইলে এই বৃদ্ধ বয়সে এ ভাগ্য হ'ল কি ক'রে?

নিজেদের ঘরের গাইয়েরই বাছুর। সাদা ধবধবে রঙ; অত্যন্ত শান্ত, বাড়ির লোকের গা চেটে চেটে পাশে পাশে ফিরত। সে যখন বড় হয়ে সন্তান প্রসব করলে না, তখন সকলে বিরক্ত হয়ে উঠছিল। সেই সময় ঘটল এই ঘটনা। পটুয়া-পাড়ার সকলে ভিড় ক'রে দেখতে এল। শুধু পটুয়াপাড়া নয়, গ্রাম-গ্রামান্তরের চাষী-সদ্‌গোপেরা এল, গোয়ালপাড়ার ঘোষেরা এল, বিপ্রচক্র গ্রামের ভটচাজ এলেন। সকলে একবাক্যে স্বীকার ক'রে গেল, হ্যাঁ, নাথুর পূর্বপুরুষের সেবা আর নাথুর জন্ম-জন্মান্তরের সৎকর্মে তিলার্ধ সন্দেহের অবকাশ নাই। এবং এতেও কোন সংশয় নাই যে, এইবার নাথুর সংসার ধনে ধান্যে সুখে শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

নাথুও তাতে সন্দেহ করলে না—সে আশা ক'রেই ব'সে রইল। তার লক্ষণও যেন দেখা দিল। কামধেনুর দুধের জন্য লোক আসতে আরম্ভ করলে। আগে দেশে ছিল এক আনা সের দুধ—টাকায় ষোল সের; এখন আক্রাগণ্ডার বছরে টাকায় আট সের—এক সের দুধের দু আনা দাম। নাথু কামধেনুর দুধের দাম স্থির করলে চার আনা সের। লোকে আপত্তি করলে না। এই আপত্তি না করাটাই তার কাছে সৌভাগ্যসমাগমের প্রথম লক্ষণ ব'লে মনে হ'ল। কিন্তু কামধেনু সমস্ত দিনে দুধ দেয় এক সের, প্রচুর সেবা ক'রেও পাঁচ পোয়ার বেশি দুধ উঠল না। তখন চার আনাকে সে তুললে আট আনায়। লোকে তাতেও আপত্তি করলে না। দৈনিক দশ আনা পয়সা কামধেনুর আশীর্বাদ। তা ছাড়া মধ্যে মধ্যে আরও উপার্জন হয় আকস্মিকভাবে। নাথু যায় ভিক্ষায়। কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, এক হাতে মন্দিরা, এক হাতে সরু বাঁশের তেলে-পাকানো লাল রঙের দেড় হাত লম্বা লাঠি, মাথায় গামছার পাগড়ি, গায়ে ঢিলেঢালা বেমানান রকমের একটা ভিক্ষেয়-পাওয়া জামা।

সুরভিমঙ্গল গান ক'রে ভিক্ষে পায় চাল। গো-চিকিৎসা ক'রে পায় দুআনা-চারআনা বকশিশ। কোথাও কারও বাড়িতে গরুর অসুখের কথা শুনলে নিজেই গিয়ে উপস্থিত হয়। এই নিয়ম, এই ওস্তাদের আজ্ঞা, পিতৃপুরুষের এই আচার। অবোলা জীব, তার জন্যে ডাকবে কে? সাক্ষাৎ ভগবতী, তার সেবার জন্যে আহ্বানের প্রয়োজন আছে নাকি?

প্রথমেই গরুর গায়ে হাত দেয়। স্পর্শ মাত্র শরীরে তার শিহরণ খেলে যায় কি না পরীক্ষা করে। তারপর জিভ দেখে, মাড়ি দেখে, ঘা দেখা দিয়েছে কি না পরীক্ষা করে। কানের ডগা মুঠোয় চেপে ধ'রে পরীক্ষা করে। পায়ের ক্ষুর দেখে।

তারপর ভিক্ষার ঝুলির ভিতর থেকে বার করে ছোট একটি ঝুলি। হরেক রকম শিকড়, জড়ি, বুটির মধ্য থেকে বেছে ওষুধ দেয়।

বাদ্‌লার অর্থাৎ জ্বরের ওষুধ, ঘুঁট্‌কের ওষুদ, ঘুঁড়িয়ার ওষুধ। 'গুটি' অর্থাৎ বসন্ত হ'লে মুখ ম্লান ক'রে বলে, মা-শীতলার পূজা করান মা, পুষ্প বেঁধে দিন গোয়ালের চালের বাতায়, চরণামেত্ত খাইয়ে দেন সব মা-ভগবতীকে। মায়ের রোষ, এর আর ওষুদ কোথা বলুন?

ওষুদের দাম জিজ্ঞাসা করলে জিভ কেটে বলে, ও কথা বলবেন না, ওষুদের দাম নিতি নাই। তারপর হেসে বলে, দামই বা কি বলেন? নদীর ধারে খোদাতায়লা শ্রীহরি করেছে গাছের 'নিবৃন্ন', তারই শিকড় আর পাতা। কতক তো আবার ঘরের পাঁদাড়ে, তুলে নিয়ে আসি। বড়িগুলান বানাতে এক পয়সার গোলমরিচ কি আনা-টাকের সিদ্ধি—কি দু পয়সার অন্য কিছু লাগে; তা গেরস্তর দুয়োরে গোধনমঙ্গল গান ক'রে তো ভিক্ষে পাই। পেট ভ'রেও তো দু-চার আনা বাঁচে মাসে। তবে—

হাত দুটি জোড় ক'রে বলে, তবে যদি বশকিশ করেন, দু হাত পেতে নোব, নাম করতে করতে বাড়ি যাব।

কি বকশিশ নেবে বল? কি হ'লে খুশি হও?

গেরস্তের হাত ঝাড়লে তাই আমাদের কাছে পর্বত। যা দেবেন তাতেই খুশি। না-দেবেন তাতেও খুশি; গোমাতার সেবা করলাম, সেই পুণ্যিতে পারে যাব, আমার ছেলেপুলে ভাল থাকবে—মা-সুরভির আশীর্বাদে।

ছেলেপুলে নাই নাথুর, তবু ওই কথাগুলি গড়গড় ক'রে ব'লে যায়, পিতৃপুরুযের কথা, নিজের ছেলেপুলে নাই ব'লে কি সে কথার খানিকটা বাদ দিয়ে অঙ্গহীন করতে পারে?

এক এক গৃহস্থ বাড়িতে—বিশেষ ক'রে ভদ্র গ্রামের গৃহস্থ বাড়িতে—গরুর ব্যাধি লেগেই থাকে। তাদের বলে, আপনারা বাবুলোক—সদ্‌জাতি, গরুর সেবা আপনাদের রাখালের হাতে। মা-ভগবতী অবহেলা সইতে লারেন বাবু। ভাল ক'রে যত্ন লিবেন। নিজে হাতে সেবা না করেন, নিজে দাঁড়িয়ে চোখে দেখবেন হুজুর।

দেখি তো বাপু। নিজে দু বেলাই দাঁড়িয়ে দেখি।

তবে?—চিন্তিত হয় নাথু। চিন্তা ক'রে বলে, তবে গোয়ালের দোষ হয়ে থাকবে।

বাড়ির প্রৌঢ়া গৃহিণী—গৃহস্বামীর মা এবার আগিয়ে আসেন; বলেন, দোষ হয়েছে কি না তুমি বলতে পার?

জানি বইকি মা। এ যে আমার পিতি-পুরুষেই কুলকরম। গুনে বলতে পারি।

আমার চল্লিশটা গরু। বড় বড় বলদ। দেড়শো-দুশো এক-একটার দাম।

আহা, মা, তুমি ভাগ্যবতী!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রৌঢ়া বলেন, সে সব তো পুরনো কথা বাবা। আজ পাঁচটিতে ঠেকেছে।

নাথুর মাথা ঘন ঘন নড়তে থাকে সমবেদনায়, আক্ষেপে,—আহা-হা,

আহা-হা! আহা-হা মা! সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের পিছনে জিভ টেনে টেনে আক্ষেপব্যঞ্জক শব্দ তোলে—চুক্ চুক্ চুক্ চুক্।

একটা একটা রোগ হচ্ছে—মরছে। প্লেগ হ'লে, ভালও তো হয়; কিন্তু আমার ঘরে রোগ হ'লে গরু বাঁচে না।

আহা মা!—প্রৌঢ় নাথু হলুদ চোখ তুলে তাকায় প্রৌঢ়ার দিকে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

দুধোল গাই একটা সেদিন আমার ধড়ফড় ক'রে ম'রে গেল। দেখ তো গুনে—গোয়ালের কি দোষ হ'ল?

গোয়ালের আঙিনায় চলেন মা।

গোয়ালের আঙিনায় ব'সে ভিক্ষার ঝুলি থেকে বার করে লাল খেরুয়ার তৈরি ছোট থলিটি। থলিটি খুলে বার করে এক টুকরো খড়ি। হাত দিয়ে সামনের খানিকটা জায়গায় ধুলো পরিষ্কার ক'রে নেয়, তারপর বার বার ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে সরিয়ে দেয়, তারপর নিজের মাথার গামছা নিয়ে খুঁট দিয়ে পরিষ্কার করে। পরিষ্কার জায়গাটার উপর খড়ি দিয়ে তিনটি সমান্তরাল রেখা টানে। তার সামনে নিজের বাঁ হাত পেতে বিড়বিড় ক'রে কত কিছু ব'লে যায়। বিড়বিড়মন্ত্র শেষ ক'রে বেশ চীৎকার ক'রে বলে—দোহাই মা কাঁউরের কামিক্ষে! দোহাই তেত্রিশ কোটী দেবতার! দোহাই রসুলে আল্লার! দোহাই মুনি ঋষির! দোহাই পীর গাজীর!—

"যদি কিছু থাকে তো বলিস।
না যদি হয় তো ডাইনে বাঁয়ে চলিস।"

হাত তার চলতে থাকে মাটির উপরে। ডাইনে যায় না, বাঁয়ে যায় না—সমান্তরালরেখা তিনটির মাঝখানে গিয়ে থেমে যেন চেপে ব'সে যায়।

নাথু মুখ তুলে প্রৌঢ়ার দিকে চেয়ে বলে, আছে মা, দোষ আছে।

কি দোষ ?

চুপ ক'রে থাকে নাথু।

কি দোষ, বল ?

চোখ বুজে নাথু বলে, বহুকালের পুরনো গোয়াল মা আপনার, অনেক গরুর রোগের বিষ জ'মে আছে মা, অনেক কালের গোবর চোনা জ'মে আছে। তা ছাড়া, মানুষেও দোষ করে—মদ এনে লুকিয়ে রাখে, মাংস এনে খায়। অভয় দেন তো বলি মা—ব্যভিচার হয় ব'লেও সন্দ হয় মা।

অভিযোগের কোনটাই অসম্ভব নয়। গোবরচোনা সত্যিই জ'মে আসিছে দীর্ঘকাল ধ'রে। আগে কৃষাণেরা চাষের আগে গোয়ালের মাটি কেটে তুলে নিত, সার হিসেবে ব্যবহার করত জমিতে, আজকাল সে কষ্ট তারা করে না। বাউরী ডোম রাখাল মাহিন্দারে বাবুদের গোয়ালের মধ্যে বেআইনি চোলাই মদ লুকিয়ে রাখে—পুলিসের ভয়ে; সেখানে ব'সে মাছ-মাংসের সঙ্গে মদও খায়। আর ব্যভিচারও হয়। বাড়ির কর্মচারী থেকে মাহিন্দার পর্যন্ত তাতে লিপ্ত। স্বৈরিণী হরিজন-কন্যার অভাব নাই ; গোয়ালের মত নির্জন অন্তরালও নাই। অভিযোগ-গুলি অবহেলিত গোপন সত্য। অথচ পাপ—তাতে সন্দেহ নাই। মায়ের মুখ থমথমে হয়ে উঠে। তিনি ছেলেকে বলেন, শুনলে তো ? প্রতিবিধান কর এ সবের। নইলে শেষ পর্যন্ত বাড়ির লক্ষ্মীও বিদায় নেবেন।

আহা মা, তুমি পুণ্যাত্মা। দিব্য বুদ্ধি তোমার !—নাথু মুগ্ধ হয়ে যায় প্রৌঢ়ার কথা শুনে।

প্রৌঢ়া এবার নাথুকে বলেন, এর উপায় বলতে পার ?

প্যারি মা। সাতটি তুলসীপাতা, সাতটি বেলপাতা, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ, গোরক্ষনাথ শিবের আশীর্বাদী, আর সর্বজয়া—বেনের দোকানে

রাবেন মা সর্বজয়া, এই এক সঙ্গে ক'রে পুঁতে দেবেন গোয়ালে। আর গোয়ালের মাটি তুলে দেন; দেওয়ালগুলি নিকিয়ে দেন। আবার মা-সুরভির দয়া হবে। নবলক্ষ পালে গোয়াল আপনার ভ'রে যাবে।

কিন্তু গোরক্ষনাথের আশীর্বাদী কোথায় পাব? সে তো অনেক দূর!

আমি দিব মা। আমার কত্তাবাপ গিয়েছিল। সেই আশীর্বাদী তিন পুরুষ ধ'রে আমাদের আছে মা। বাবা গোরক্ষনাথের নাম নিয়ে নতুন বেলপাতা তাতে দিয়ে দিয়ে রাখি। এক ফোঁটা গঙ্গাজল পরশ করলে পাপ যায়। এক কলসী জলে দিলে, সেও গঙ্গাজল হয়ে উঠে।—বলতে বলতেই সে ঝুলি খুলে একটি শুকনো বেলপাতা বার ক'রে আলগোছে মায়ের হাতে ফেলে দেয়।

মা খুশি হয়ে নাথুকে দেন একখানা পুরানো কাপড়, একটা জামা, আট আনা পয়সা এবং আঁচল ভ'রে চাল, তার সঙ্গে মুড়ি আর নাড়ু।

নাথুর কৃতজ্ঞতার আর সীমা থাকে না। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, মঙ্গল হবে মা, কল্যাণ হবে মা, ধর্মের সংসার তোমার, তোমার পুণ্যে—যে পাপ বাইরে থেকে আসুক, আগুনের মুখে তুলোর মত, খড়ের মত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে মা।

মা হাসেন—পরিতৃপ্তিতে স্নিগ্ধ মিষ্ট হাসি।

নাথু বলে, আপনি গোয়ালের মাটি কাটান, দেওয়াল নিকান। তারপর একদিন আমার মা-সুরভিকে এনে আপনার গোয়ালে নিশ্বাস ফেলিয়ে পবিত্র করিয়ে দিব, সুরভির গোবরে চোনায় সব দোষ কেটে যাবে মা। আমার বাড়িতে কামধেনু আছেন মা।

কামধেনু?—প্রৌঢ়ার বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

হ্যাঁ মা, কামধেনু।

নাথু সগৌরবে কামধেনুর বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে, আশ্বিন মাসের সাদা নরম মেঘের মত বরণ, তেমনই কোমল আমার মায়ের অঙ্গ।

।'.জানেন মা ?" জানবেন বইকি—লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—হীরা মণি মুক্তা
াল, এ সবই তো মায়ের ভাণ্ডারে আছে। তেমনই বরণ আমার
ধেন্থর 'পালানে'র, মাখনের মত নরম—মোলাম।

ব'লেই যায় নাথু, ব'লেই যায়। থামতে চায় না, মনে হয়, বলা
না।

মা বলেন, তুমি ভাগ্যবান বাবা। এনো একদিন, নিয়ে এসো। মায়ের
া করব আমি।

তারপর হঠাৎ বলেন, 'বলোয়া' নিয়ে হিন্দুস্থানীরা বেড়ায়। তুমি
ার কামধেনু নিয়ে বেড়াও না কেন বাবা? গেরস্তের মঙ্গল হয়।
ারও মায়ের কৃপায় রোজগার হয়।

াজার ঘরের মেয়ে—রাজার ঘরের রাণী—রাজার মা—রাজবুদ্ধি।
বুদ্ধি আর মা-সুরভির মাহাত্ম্য। নাথুর সংসার পরিপূর্ণ হয়ে
কামধেন্থর শিঙ দুটিতে সে পিতলের খাপ পরিয়ে দিলে। গলায়
। দিলে চার পাঁচ সারি লাল সবুজ হলুদ কালো পাথরের মালা;
সঙ্গে ঘুঙুর, ঘণ্টা; পিঠে চাপিয়ে দিলে ছাপানো কাপড় কড়ি
সুন্দর দোলাই। মাকে নিয়ে সে গ্রামে গ্রামে ঘুরত। পরীক্ষা
কামধেন্থর বাঁট টিপে দুধ বার ক'রে। বেলা দুপহর পর্যন্ত গেরস্তের
ঘুরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে মাঠের কোন দিঘির ঘাটে এসে ব'সে নিত
চবুত; কামধেন্থর সামনে বিছিয়ে দিত একখানি গামছা, ত
দিত ভিক্ষার চালের কিছু চাল, কামধেনু চালগুলি খেয়ে ঘাটে জল
তারপর উঠে এসে নাথুর পিঠ চাটত, মাথার চুল চাটত।

* * *

ং কি যে হ'ল! জানেন খোদাতায়লা, জানেন ভগবান গোলক-
র, জানেন পয়গম্বর, জানেন মুনি ঋষিরা, সাধু মহাত্মারা। তাই-বা

কেন? নাথুও জানে। জানবে না কেন? পাপ। পাপে ভ'রে গেল দুনিয়া। পাপের ভারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটতে লাগল। মহামারণ চলতে লাগল, তার আর বিরাম নাই। সে বছর বানে দেশ গেল ডুবে হেজে। ফিরে বছরে শীতকালে মাঘ মাসের পয়লা পৃথিবী উঠল কেঁপে—ভূমিকম্প! নাথু গিয়েছিল মা-সুরভিকে নিয়ে গ্রামান্তরে। দুপুরবেলা দুনিয়া টলতে লাগল—বাড়ি দুলছে, বড় বড় গাছ দুলছে, দিঘির জল এ পার থেকে ঢেউ তুলে ও-পারে ছুটছে, ও-পার থেকে হুড়হুড় ক'রে এ পারে আসছে, আছাড় খেয়ে পড়েছে। মাটির ভেতর থেকে শব্দ উঠছে—যেন দশ-বিশটা রেল-ইঞ্জিন ছুটে আসছে, সে ইঞ্জিনে 'ডেরাইবর' নাই। মা-সুরভি ব'সে পড়ল মাটির উপর, নাথু উল্টে প'ড়ে গেল। বসুমতী স্থির হলেন, নাথু বাড়ি এল। বাড়িঘরের চিহ্ন নাই, প'ড়ে আছে শুধু ভাঙা দেওয়াল, আছাড় খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়া চাল। কোথায় স্ত্রী, কোথায় ছেলেরা, কোন সন্ধান মিলল না। তিন দিন লাগল মাটি সরাতে; তখন মিলল সন্ধান; পচা গন্ধ বেরিয়েছে তখন।

তার পর-বছর এল আরও ভয়ঙ্কর বছর। পৃথিবীর মাটি শুকিয়ে হ'ল কাঠ, তেতে হ'ল আগুন, আকাশ গেল রন-কুয়াশায় ভ'রে—মেঘ গেল উড়ে, বাতাস হয়ে উঠল আবিল, নদী গেল শুকিয়ে, পুকুরে দিঘিতে জেগে উঠল পাঁক—শুকিয়ে শুকিয়ে তাও ফেটে হ'ল চৌচির। মাটি জল বাতাস দূরের কথা, নাথুর কামধেনুর দুধ গেল শুকিয়ে। একটা গ্রামে ঘুরলে চাল-কাপড়ের বোঝা নাথুর পক্ষে ভারী হয়ে উঠত। তিনটে গ্রামে ঘুরেও নাথুর ঝুলির অর্ধেকের উপর খালি থাকতে আরম্ভ করল।

সেই বছর।

নাথুর পরীক্ষা। নাথুর সামনে এসে দাঁড়াল জগদীশ পটুয়ার বিশ বছরের যুবতী মেয়ে ফুলমণি। ভূমিকম্পে স্ত্রী-পুত্র-ভরা সংসার মাটির দেওয়াল চাপা প'ড়ে জীয়ন্তে যেমন খোদাতায়লার মর্জিতে

ভগবানের কোপে কবরে গেল, তখন আর সংসার সে করবে না বলেই সংকল্প করেছিল। কিন্তু ফুলমণি এল—মুনিঋষিদের সামনে স্বর্গের অপ্সরারা ঘাড় বেঁকিয়ে, গালে একটি আঙুল রেখে, একটু হেসে যেমন ভাবে এসে দাঁড়াত, তেমনই ভাবে এসে দাঁড়াল। ফুলমণির স্বামী হাঁপানীর রোগী, তার উপর এই দুর্ভিক্ষের বছর সে পেটের জ্বালায় ফুলমণিকে এক শো টাকা আর পাঁচ মণ চাল নিয়ে হেফাজদ্দি শেখ পাইকারকে বেচবার ফন্দি করছিল; কিন্তু ফন্দির ফাঁস এড়িয়ে ফুলমণি পালিয়ে এসেছে বাপের বাড়ি। কুৎসিত কদাকার হেফাজদ্দির তুলনা দিয়ে পটুয়ার মেয়ে ফুলমণি বলেছে, ওর চেয়ে যমদূতেরা কাত্তিক।

– তার মানে?

বাঁকা চোখে চেয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে ফুলমণি বললে, পটুয়ার ছেলে ছড়া-পাঁচালি গান কর, এর মানে যদি না বুঝ তবে আমার নয়—তোমার মরণ ভাল।

ফুলমণির এমন রূপ কিছু ছিল না, যা ছিল তাও হাঁপানীর রোগী স্বামীর হাতে প'ড়ে বিশেষ ক'রে এই বছরে একেবারেই গিয়েছে। তবে ফুলমণির রূপে যে দুটি ছিল অপরূপ, সে দুটি এতেও যাবার নয়—যায়ও নাই। ভাসা-ভাসা ডবডবে চোখ আর পাতলা বাঁকানো দুটি ঠোঁট—বিশেষ ক'রে চোখ। দেখলে মনে হয়, মেয়েটার চোখে যেন কিসের ঘোর লেগে রয়েছে, চোখের দিকে তাকালে ওই ঘোরের ছোঁয়াচ লেগে যায়।

সেলের গরাদে ধ'রে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নাথু। এতক্ষণে সে নড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে এ-পাশ ও-পাশ দেখলে একবার; তারপর পিছন ফিরে সেলের ভিতরটা একবার ভাল ক'রে দেখলে। সমস্ত ঘরটা একবার ঘুরলে। আবার এসে সে গরাদে ধ'রে দাঁড়াল। তারপর হাঁকতে লাগল, সিপাইজী—সিপাইজী—সিপাইজী!

কেয়া ?

কয়লা—কয়লা, এক টুকরো পোড়া কয়লা।

কয়লা? কয়লা কেয়া হোগা ?

ছবি আঁকেগা—ছবি।

আরে! কেয়া তুম পাগলা হো গিয়া? যাও, যাও, বইঠো, আরাম করো, নিদ যাও।

চ'লে গেল ওয়ার্ডার।

সিপাহীজী—এ সিপাহীজী—! এ সিপাহীজী—ইঃ। এ—হো সিপাহীজী—হোঃ! এ—

ওয়ার্ডারটা ফিরে এসে এক টুকরো পোড়া কয়লা ছুঁড়ে দিয়ে গেল। নাথু সাগ্রহে কুড়িয়ে নিয়ে একটা কোণে ব'সে ছবি আঁকতে আরম্ভ করলে। চোখ আঁকতে লাগল। 'সুরভিমঙ্গল' গান গেয়ে ভিক্ষে ক'রে দিন কাটালেও নাথু পটুয়ার ছেলে। নাম জিজ্ঞাসা করলে বলত, নাথু চিত্রকর; জাতিতে পটুয়া, ধর্মে ইসলাম। তুলি একেবারে না-ধরা নয়। ছবি আঁকার খেয়ালটাও তার পাগলামি নয়। সে পাগল হয়ে যায় নি, ফুলমণির চোখ দুটো মনে প'ড়ে বুকে তার নেশা জেগে উঠেছে। খেয়াল হয়েছে, যদিন বাঁচবে,—ফুলমণির চোখ দুটো ব'সে বসে দেখবে। বড় বড় ডবডবে দুটো চোখ!

ওই চোখের সে কি নেশা! পটুয়ার ছেলে নাথু, ছড়া—মঙ্গলগান অনেক জানে। ফুলমণির চোখের কথা বলতে গেলে একটি কথা তার জিভের ডগায় আপনি এসে পড়ে;—'মুনিজনের মন-ভুলানো'। কথা বলতে বলতে ফুলমণির চোখের পাতা ঢ'লে নেমে আসত, চোখ দুটি হ'ত তখন আধখানা চাঁদের মত; অঘোরে ঘুমোলে ফুলমণির চোখ হ'ত যেন রমজানের চাঁদের ফালি। আর তার দুই পাতলা বাঁকা ঠোঁট—

মনে হ'ত, অহরহই যেন মুচকে হাসছে, যে হাসির মানে ঠিক বুঝা যায় না, শুধু আন্দাজ করা যায়। ফুলমণির চোখ দেখে যে নেশা লাগে, সে নেশার ঘোরে মিঠে হাওয়ার আমেজ লাগিয়ে দেয় ওই বাঁকানো পাতলা ঠোঁটের মিহি মুচকি হাসি।

মুনি-ঋষির তপস্যা যায়, রাজার রাজ্যনাশ হয়, মোহিনীর মোহে শিব ছোটেন পাগলের মত; স্বর্গের দেবতার অভিশাপ ভিন্ন এ নেশার ঘোর কাটে না। নাথু তো ছার মানুষ। আপসোস নাই, খেদ নাই, মোহিনী মায়ায় ভুলেছিল নাথু।

সকালে উঠে খোদাতায়লা রসুলে আল্লার নাম নিচ্ছিল, দয়াময় হরিকে ডেকে—হরি রক্ষা কর, মেঘ দাও, জল হোক—দুনিয়া ঠাণ্ডা হোক, চাষবাস হোক, শুকনো মাটিতে দুর্বো গজাক, মানুষ বাঁচুক, গরু-বাছুর বাঁচুক, আমার মা-সুরভি ঘাস খেয়ে বাঁচুক।

কামধেনুর পাঁজরা বেরিয়েছে, বাঁটে আর দুধ নাই। ভিক্ষেয় গিয়ে চাল যা মেলে, তার দু মুঠোতে কামধেনুর পেট ভরে না, বাকি দু মুঠোয় নাথুর পেটেরও জ্বালা ঘোচে না। যে দিন যায় সে সেই ভাল-মায়ের বাড়ি, সেদিন সেখানে কিছু মেলে। দু আঁটি খড়, কিছু ভুষি, কিছু চাল খেতে পায় তার সুরভি, সেও আঁচল ভ'রে মুড়ি পায়, সের খানেক চালও মেলে। ভাগ্যবানের সংসার, রাজা জমিদারের বাড়ি, মা-লক্ষ্মীর অচলা বাস সেখানে, দুনিয়ার অভাব সেখানে ঢুকতে পায় না। নদী শুকিয়েছে, নালা শুকিয়েছে, পুকুর শুকিয়েছে, ডোবা ফেটে কাঠ হয়েছে, তাই ব'লে গঙ্গায় কি জলের অভাব? না, সাগর-সমুদ্রে চড়া পড়েছে? কিন্তু এক বাড়িতে নিত্য তো যাওয়া যায় না। ব'সে ব'সেই ভাবছিল নাথু। হঠাৎ এল ওই সর্বনাশী। ফুলমণি এল—হাতে এক মুঠো কাঁচা ঘাসপাতা।

সুরভির মুখে ঘাসের মুঠোটি ধ'রে দিয়ে, দু হাতে তার গলা জড়িয়ে

মুখের পাশে মুখ রেখে সুরভিকে বললে, মাঠে গেলাম সাঁয়ো ঘাস তুলতে, সাঁয়ো ঘাস পেলাম না, তোমার জন্য নিয়ে এলাম খুঁটে খুঁটে এই ঘাস মুঠোটি। খাও তুমি। মধ্যে মধ্যে চোখের পাতা যখন সে তুলছিল, তখন নাথুর চোখের উপর পড়ছিল তার দৃষ্টি; যখন চোখের পাতা নামছিল, তখন সে চোখে লাগছিল আধখানা চাঁদের নেশা।

মোহিনী মায়া।

নাথু ভুলে গেল—আল্লাতায়লা পয়গম্বর দয়াময় হরির কাছে কি বলছিল, সে সব কথা। পেটে ভুখের আগুনের দাহ যেন আর বুঝতে পারলে না; সে উঠে গিয়ে ধরলে ফুলমণির হাত।

ফুলমণি উঠে হাত ছাড়িয়ে স'রে দাঁড়াল, একটু হেসে ঘাড় বাঁকিয়ে তেরচা চোখে চেয়ে বললে, ছি, ছি! পাতলা ঠোঁটে তার সেই মিহি হাসির আমেজ।

নাথু বললে, আমাকে নিকা করবে? বল?

ফুলমণি বললে, সেই 'হেঁপো' রুগী আসছে হেফাজ্জদিল্ক নিয়ে। এক শো টাকা আর পাঁচ মণ চাল আমার দাম। পারবে দিতে?

ব'লে সে চ'লে গেল।

মুনির তপস্যা যায়, রাজার রাজত্ব যায়, সে কি তাদের লোকসান মনে হয়? যদি হবে, তবে তারা মাতে কেন? নাথুর আপসোস নাই। সে কামধেনুকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালে ভাল-মায়ের বাড়ির উঠানে।

আমার মা-সুরভিকে কিনবেন মা?

বেচবে তুমি?—মা আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

বেচব মা। মায়ের আমার দশা দেখেন। আমার পেট দেখেন, পিঠে গিয়ে ঠেকেছে।

আর বলতে লজ্জা হ'ল নাথুর। বলতে পারলে না ফুলমণির কথা।

আমি তো দু-একবার আগে বলেছি তোমাকে। তখন তো রাজী

হও নি। তা বেশ, দিতে যদি চাও—যদি মনে কোন দুঃখ না রেখে দিতে পার, তবেই আমি নিতে পারি।

এই মা-সুরভির গায়ে হাত দিয়ে বলছি মা, 'হিয়ে খোলসায়' দিব আমি। সেবার আমাকে আড়াই শো টাকা দিতে চেয়েছিলেন—সেই দাম দিবেন।

সে বাজারে এ বাজারে তফাত আছে বাবা। দুর্ভিক্ষের বাজারে দশ টাকার জিনিসটা পাঁচ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

স্তব্ধ হয়ে রইল নাথু। এক শো টাকা, পাঁচ মণ চাল—য়ে হবে এক শো পঞ্চাশ। আড়াই শো টাকার অর্ধেক কত? দু শো— অর্ধেক এক শো, পঞ্চাশের অর্ধেক—

মা বললেন, আচ্ছা, তাই পাবে তুমি। যখন বলেছি নিজে — তখন তাই দোব। কিন্তু দেখো বাবা, মনে কোন দুঃখ রেখো না।

না না না না। কুনও দুঃখ করব না। কখুনও না। —বানের নাম নিয়ে বলছি মা, না না না।

মায়ের ছেলে ইংরিজী-পড়া বাবু। তিনি বললেন, খেপেছ — কি? আ-ড়া-ই-শো—টাকা?

কামধেনু টাকা পয়সা দিয়ে পাওয়া যায় না বাবা।

কামধেনু? সে আবার কি? ও-সব বাজে কথা।

না না, ও-কথা বলতে নেই। জান কি সন্তান প্রসব না ক রে গরুটি দুগ্ধবতী হয়েছে?

হেসে বাবুটি যে ক— বলেছিলেন, সে কথা আজও কানের কাছে বাজে নাথুর—'ও-রকম হয়; ওকে বলে,প্রকৃতির খেয়াল। খবরের কাগজে পড় নি, জোয়ান ছেলে হঠাৎ মেয়ে হয়ে গেল, মেয়ে দেখতে দেখতে বেটাছেলে হয়ে গেল! কিন্তু তারা তো শিখণ্ডী নয়, অর্জুনও নয়।

মা রাগ ক'রে নিজের বাক্স থেকে টাকা বার ক'রে দিয়েছিলেন নাথুকে।

টাকা নিয়ে নাথু বাড়ি ফিরল।

পথে কি কেঁদেছিল?

মনে পড়ে না।

জেলখানায় ব'সে নাথু ফুলমণির চোখের ছবি আঁকতে আঁকতে কখন ছবি আঁকা ছেড়ে স্থির হয়ে ব'সে দেওয়ালের দিকে চেয়ে ছিল। দেওয়াল ভেদ ক'রে, শহর পথ মাঠ ঘাট পেরিয়ে চ'লে গিয়েছিল। হঠাৎ সে আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। বিস্মিত হয়ে ভাবছিল সে, কই, কান্নার কথা তো মনে পড়ছে না?

মনে পড়ছে বড় বড় ডবডবে দুটি চোখ।

খুব জোরে হেঁটে বাড়ি ফিরেছিল সে।

কোন আপসোস হয় নি তার। ফুলমণিকে নিকা ক'রে সারারাত তাকে নিয়ে জেগে ছিল। আপসোস হ'ল মাসখানেক পর। ফুলমণির নেশাটা যেন ক'মে এসেছে তখন। মাসখানেক পর সে ভাল-মায়ের বাড়িতে এসে দাঁড়াল। ঠুন ঠুন ক'রে মন্দিরায় আওয়াজ তুললে।

মা-সুরভিমঙ্গল করবেন মা? বাড়ির বাছাদের দুধে ভাতে রাখবেন। ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হবে। আহা আহা, সুরভিমঙ্গল গান গোধন-মহিমা মা গো, গোধন-মহিমা—

মা বললেন, এস, ভাল আছ?

কেঁদে ফেললে নাথু।—না মা, ভাল নাই।

কি হ'ল?

কি হবে মা? পাতকীর জীবনে সুখ থাকে মা?

চুপ ক'রে থাকেন মা। একটু থেমে চোখ মুছে নাথু আবার আরম্ভ

করে গান, "ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণে দিতে নারে সীমা।" গান শেষ ক'রে ভিক্ষা নিয়ে নাথু বলে, একবার মা-সুরভিকে যে দেখব মা।

দেখবে বইকি। যাও, দেখ। তুমি তো জান সব।

সুরভিকে দেখে নাথু যেন কেমন হয়ে গেল। এক মাসেই গায়ে ভ'রে উঠেছে সুরভি। সাদা রোঁয়াগুলি যেন চিকচিক করছে রোদের ছটা পেয়ে। কাঙালের ঘরের মেয়ে বড়লোকের ঘরে বিয়ে হয়ে যেমন রূপে জৌলুসে ফেটে পড়ে, তেমনই চেহারা হয়েছে সুরভির। সুরভি ফিরে তাকালে নাথুর দিকে।

সে চোখ দেখে নাথু ভুলে গেল ফুলমণির চোখ।

তার ইচ্ছে হ'ল, বুক ফাটিয়ে কাঁদে।

ইচ্ছে হ'ল, দড়িটা খুলে সুরভিকে নিয়ে ছুটে পালায়।

হঠাৎ নিজেই সে প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল। জনহীন মাঠের পথে এসে সে কাঁদলে—খুব জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদলে।

বাড়ি গিয়ে সেদিন ঝগড়া হ'ল ফুলমণির সঙ্গে।

রাত্রে ঘুম হ'ল না। মাঝরাত্রে সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠানে দাঁড়াল।

রাত্রের অন্ধকারে গিয়ে নিঃসাড়ে গোয়ালের দরজা খুললে, কিন্তু— ভয়ে সে ঘেমে উঠল। ফিরে গিয়ে বসল নিজের দাওয়া'র উপর। শেষরাত্রে সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন আবার গেল। সেদিন রাত্রে সে মাঠের ধার পর্যন্ত এসে ফিরে গেল।

আবার গেল পরদিন। ভাল-মায়ের বাড়ির ঝি বললে, ওমা, এ যে এবার নিত্যি আসতে লাগল গো!

মা ধমক দিলেন। নাথু লজ্জায় ম'রে গেল। সেদিন সে সুরভিকে দেখে ফিরে মাঠে পুকুরপাড়ে গাছতলায় গামছার খুঁট খুলে মুড়ি বার

ক'রে ব'সে রইল সামনের দিকে চেয়ে। অনেকক্ষণ পরে এক মুঠো মুড়ি মুখে পুরে না চিবিয়ে ব'সে রইল কিছুক্ষণ। বহুক্ষণ ধ'রে মুড়ি খাওয়া শেষ ক'রে ঝোলার ভিতর থেকে লাল খেরুয়ার থলিটি বার করলে। নাড়লে চাড়লে। তারপর বাড়ি ফিরল। পথে 'কাঁদর' অর্থাৎ সেই ছোট নদীটির ধারের ঘাটে এসে থমকে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ ভেবে সে নদী পার না হয়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকল। ঘন জঙ্গল, কত রকমের গাছ, কত রকমের লতা। খুঁজতে লাগল নাথু একটা কিছু।

পটুয়াদের পটের শেষ অংশে আছে ধর্মরাজের দরবার। চিত্রগুপ্ত হিসাব রাখেন পাপ-পুণ্যের। রথে চ'ড়ে পুণ্যাত্মা যায় স্বর্গে। ফুল ফলে ভরা বাগান, কূলে কূলে ভরা নদী, মণি-মাণিক্যে সাজানো বাড়িঘর। পাপীরা যায় নরকে। আবছা অন্ধকার। নানা ভয়াবহ দৃশ্য। তার মধ্যে আছে একটি জলভরা কুণ্ড। প্রথমটার জল স্থির। দ্বিতীয়টার সে জলে ঢেউ উঠেছে—নীচে থেকে যেন কিছু ঠেলে উঠেছে। তৃতীয়টার দেখা যায়, জলের উপরে মাথা তুলে উঠেছে সাপ, লিকলিক করছে তার জিভ। নাথুর মনে হ'ল, ঠিক তাই, ঠিক তাই।

গো-চিকিৎসক নাথু। ওষুধও চেনে, বিষও চেনে। জঙ্গলে খুঁজছিল সে বিষ। মারাত্মক বিষ। এক পা এগোয়, থমকে দাঁড়ায়, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে খোঁজে। ওটা কি? হাঁ, এই যে। জঙ্গল থেকে বেরুল সে সন্ধ্যের মুখে।

ফুলমণির ডবডবে ঢলঢলে চোখে পাতলা বাঁকা ঠোঁটে সেদিন অনেক চুমা খেয়েছিল নাথু। কোন আপসোস হয় নাই তার—এক বিন্দু না।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল নাথু। পাগলের মত ছুঁড়ে ফেলে দিলে কয়লাটা। আর সে স্মরণ করতে পারছে না। ভয়ঙ্কর স্মৃতি।

উঠে দাঁড়িয়ে গরাদেটা ধ'রে গরুর মত শব্দ করতে লাগল—প্রায়শ্চিত্তরত গো-হত্যাকারীর মত।

* * *

ডিগ্রীর অর্থাৎ সেলের পাশে পাশে যে ওয়ার্ডার রাউণ্ড দিচ্ছিল, সে ছুটে এল। ওদিক থেকে চীফ ওয়ার্ডার, যার চার্জে তখন জেলখানা, সেও হন্তদন্ত হয়ে এল। কেয়া হুয়া হ্যায়? কেয়া?

নাথু অকস্মাৎ হাম্বা-হাম্বা ক'রে গরুর ডাক ডাকতে আরম্ভ করেছে। চোখ দুটো রাঙা লাল।

সেলের দরজা খুলে চীফ ওয়ার্ডার বললে, পানি লে আও—পানি। ঢাল্—মাথায় ঢাল্।

ফাঁসীর আসামী। আজই হুকুম হয়েছে, এখন দু দিন অনেক রকম করবে ও। মাথায় জল ঢাল্। দরকার হ'লে কুয়োতলায় নিয়ে যা। জেল-হাসপাতালের ডাক্তারকে খবর দে।

মুখের কাছে মুখ এনে নাথু বললে—যে কয়েদীটি তার মাথায় জল ঢালছিল, তাকেই বললে, পঁচিশ টাকা দোব, কাল রাত্রে বাবুদের যে গাইটা মরেছে, তার চামড়াখানা ছাড়িয়ে আমাকে দিবি।

কয়েদী বিরক্ত হয়ে বললে, কি বলছ যা-তা?

বাবুদের গাঁয়ের ভাগাড় তো তোর। ওই চামড়াটি আমার চাই।

ওয়ার্ডার এগিয়ে এল। ধমক দিলে, এই!

কম্পাউণ্ডার মেজার-গ্লাসে ওষুধ নিয়ে এসে ঢুকল।

দীর্ঘ ঘুমের পর সকালে শান্ত দৃষ্টিতে সেলের দরজার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে উঠে বসল নাথু। অ্যায়, খোদাতায়ালা, রসুলে আল্লা! লা-এলাহা ইল্লাল্লা! হে ভগবান, হে গোবিন্দ! মাফ কর। আমার সকল পাপ, সকল গোনাহ মাফির মঞ্জুর হোক। আমার ফাঁসি

হোক। মা-সুরভিকে আমি বিষ দিয়ে মেরেছি। কেউ সন্দেহ করে নাই, করবার উপায় ছিল না, গভীর রাত্রে গিয়ে সুরভির ডাবায় বিষ রেখে এসেছিল। নিজে দু দিন যায় নি। তার জন্যে আমার ফাঁসি হোক। এ ছাড়া আর কোনও পাপ নাথু করে নাই। মুচীদের কাছে সুরভির চামড়াখানি সে কিনেছিল। কিনেছিল, তার ইচ্ছা ছিল ওই চামড়াখানি নিয়ে ঘর থেকে সে চ'লে যাবে। ফকির সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।

এল হেফাজদ্দি পাইকার। চামড়ার কারবার করে। মুচীদের কাছে খবর পেয়ে এল।

চামড়া কিনেছিস?

হ্যাঁ।

ব্যবসা করছিস নাকি? আমার সঙ্গে কারবার কর্। কিনে রাখবি চামড়া। আমি আসব মাঝে মাঝে। আমার ঘোড়া আছে।

হেসেছিল নাথু। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে হেফাজদ্দিকে বলেছিল, শুধু মরা চামড়া কিনবে, না, হাড়-মাস চামড়ার সব— মানে জ্যান্ত কিনবে? ফুলমণিকে চাই?

নিবি?

হ্যাঁ।

কত?

দু শো।

তাই।

রাত্রে এস গাড়ি কিংবা ডুলি নিয়ে।

ফুলমণিকে বেচে সেই টাকায় তার চামড়ার ব্যবসা। ফুলমণির পাপ। ফুলমণির জন্যে সে মহাপাপ করেছে। সকল পাপের মূল ফুলমণি। কিন্তু তবু ফুলমণির জন্যে সে কাঁদে। কতদিন কেঁদেছে।

বেশ চলছিল। টাকা পয়সা অনেক হয়েছিল তার। দেশ গ্রাম ছেড়ে বাজারে বড় রেল-জংশনে আস্তানা গেড়েছিল। ডাঁই ক'রে রাখত চামড়া। চালান দিত এখানে ওখানে। শান্ত শিষ্ট মানুষ। রোজ সকালে উঠে বলত, আমার গোনাহ্ মাফির মঞ্জুর হোক আল্লা। পাপ খণ্ডন কর ভগবান। ধীরে ধীরে সব সে ভুলেও আসছিল।

হঠাৎ—হঠাৎ ঘটনাটা ঘ'টে গেল।

একটা শীর্ণ লোক একগাছা দড়ি হাতে এসে দাঁড়িয়ে গরুর মত ডাকতে লাগল—হাম্বা অ্যা-ম্-বা। গরু-মারা! গোহত্যাকারী! লোকটা গোহত্যা করেছে, তাই ওই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। মানুষের ভাষার বদলে, গরুর ভাষায়—মানুষের কাছে নিজের পাপের স্বীকারোক্তি জানিয়ে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। সুরভিমঙ্গল গান ছিল নাথুর একদিনের পেশা। সে জানে, সব জানে।

লোকটা গরুর ডাক ডেকে দোরে দাঁড়াতেই নাথু চমকে উঠল।

লোকটা আবার ডাকলে, অ্যা-ম্-বা—

স্থান কাল পাত্র সব গোলমাল হয়ে গেল নাথুর। মুহূর্তে পাগল হয়ে গেল সে। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল লোকটার উপর। বহুকষ্টে লোকজনে মিলে নাথুকে টেনে তুললে। লোকটার বুকের উপর ব'সে দুই হাতে সে তার গলাটা নির্মমভাবে চেপে ধরেছিল; লোকটার জিভ বেরিয়ে এসেছে, চোখ দুটো হয়ে উঠেছে দুটো রক্তের ডালা। ম'রে গিয়েছে লোকটা।

ফাঁসিতে তার দুঃখ নাই। গোহত্যাকারীকে মেরে ফাঁসি যেতে কোনও আক্ষেপ নাই তার। তবে ফাঁসিটা গরুর দাঁতে হ'লেই তার আর কোন খেদ থাকত না

লা-ইলাহা ইল্লাল্লা—রসুল আল্লা মহম্মদ, হে ভগবান, মা-সুরভি—তোমাদের মরজি সব।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে সে এপাশ ওপাশ চেয়ে কালকের কয়লাটা তুলে নিল। কি করবে সে এ কদিন? কি নিয়ে থাকবে? কাল দুটো চোখ এঁকেছিল। সে দুটোর দিকে তাকিয়ে আজ সে চমকে উঠল। ফুলমণির চোখ তো হয় নাই। এ যে গরুর চোখ হয়েছে। সুরভির চোখ! তা বেশ হয়েছে। ওরই পাশে আজ ফুলমণির ডবডবে ঢলঢলে চোখ দুটি সে আঁকবে। ও-চোখের নেশা বেঁচে থাকতে ছাড়তে পারবে না নাথু।

যাদুকরের মৃত্যু

গাছটা কেউ যত্ন ক'রে পোঁতে নাই। আবর্জনা হিসেবে বীজটা কেউ কখনও ওখানে ছুঁড়ে ফেলেছিল বোধ হয়। তারপর বর্ষার জল পেয়ে সে বীজ থেকে একদিন প্রকাশ পেল একটি অঙ্কুর। তারও মাসখানেক পরে ডাক্তারবাবু লক্ষ্য করলেন, একটি সতেজ স্বাস্থ্যবান লেবুর চারা বর্ষার বাতাসে দুরন্ত ছেলের মত লুটোপুটি খাচ্ছে। পরদিনই ডাক্তারবাবু গাছটির যত্ন নিলেন, চাকরকে ব'লে গাছটার গোড়াটা পরিষ্কার করিয়ে দিলেন। তবে তার বোধ হয় দরকার ছিল না কিছু। এক এক ছেলে যেমন দুর্বার শক্তি নিয়ে জন্মায়, অযত্নের মধ্যেও দুরন্ত হয়ে বেড়ে ওঠে, গাছটাও বোধ হয় তেমনই শক্তি নিয়ে মাটি ঠেলে উঠেছিল, এক বর্ষাতেই সে উঠল ডাক্তারবাবুর কোমর ছাড়িয়ে। পরের বর্ষায় ডাক্তারবাবুকে অতিক্রম ক'রে সে বেড়ে উঠল হু-হু ক'রে। তৃতীয় বর্ষায় তার দিকে চেয়ে তিনি আর গাছটির শৈশব-অবস্থা কল্পনা করতে পারলেন না। আশা হ'ল, আগামী বৎসরেই গাছটি ফল দিবে।

কিন্তু তৃতীয় বৎসর শেষ না-হতেই, বসন্তের প্রথমে যখন পাতা ঝ'রে গাছে গাছে নতুন পাতা দেখা দিল, সেই সময়ে গাছটা যেন তার আকস্মি জন্মের সঙ্গে তাল রেখেই হঠাৎ শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করলে। ডাক্তার দুঃখিত না হয়ে পারলেন না। শেষ চিকিৎসাও তিনি করলেন, গোড়া খুঁড়ে বালতি বালতি জল ঢালার ব্যবস্থাও তিনি করলেন। কিন্তু তবু গাছটা বাঁচল না, ম'রে গেল।

সেদিন ডাক্তার গাছটার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এমন সময় এক বন্ধু এসে বললেন, কি, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছ কি ?

গাছটার দিকে চেয়েই অল্প হেসে ডাক্তার বললেন, গাছটা ম'রে গেল।

তাই তো! সুন্দর গাছটি হয়েছিল কিন্তু! আচ্ছা, ম'রে গেল কেন বল তো?

ঘাড় নেড়ে ডাক্তার বললেন, কিছুই বুঝতে পারলাম না।

বন্ধু বললেন, এখনও গোড়াটা কাঁচা আছে, খুব জল দেওয়ার ব্যবস্থা কর।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তার বললেন, চিকিৎসার কসুর কিছু করি নি, একটা পুকুরের জল এক দিনে ওর গোড়ায় ঢেলেছি।

বন্ধু হেসে বললেন, Medicine can cure disease, but can not prevent death—অ্যাঁ, কি বল?

ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ, খুব বড় কথা, ওর চেয়ে আর বড় কথা তো ডাক্তার হয়ে বুঝলাম না।

হুঁঃ, গাছটাকে মেরে ফেলালে? আহা-হা!

কথার শব্দে মুখ ফিরিয়ে ডাক্তার দেখলেন, কুসুমপুরের ওস্তাদ প্রৌঢ় নাদের শেখ গাছটার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নাদেরের বাবরি চুলগুলি এই সকালেও সযত্নবিন্যস্ত, মাঝখানের চেরা সিঁথিটির মধ্যে এতটুকু এদিক ওদিক নাই। গোঁফ জোড়াটির দুই পাশ বেশ সুঁচালো ক'রে পাকানো, চাপ দাড়িটি পর্যন্ত সে এই সকালবেলাতেই আঁচড়ে বিন্যাস করেছে। দাড়ির মধ্যেও একটি সিঁথি টানা, একেবারে ঠিক চিবুকে সিঁথি টেনে দাড়ি দুই ভাগে ভাগ ক'রে উজানে ঠেলে দিয়ে গালপাট্টা বানিয়েছে। নাদেরের গায়ে গেরুয়ায় ছোপানো মুসলমানী ঢঙের পাঞ্জাবি, পরনে হাঁটু পর্যন্ত আঁটসাঁট ক'রে পরা কাপড়খানিও গেরুয়ায় ছোপানো, হাতে তেলে-পাকানো পিতলে-বাঁধানো এক লাঠি। ডাক্তার বললেন, নাদের যে!

গাছটাকে দেখতে দেখতে আপনার অভ্যাসমত মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে

নাদের বললে, আজ্ঞা হাঁ। কিন্তু কে এমন কাজ করলে বাবু, এমন লকুলকে গাছটাকে মেরে ফেলালে ?

ডাক্তার বললেন, আপনিই ম'রে গেল।

ঘাড় নেড়ে নাদের বললে, আজ্ঞা না। ইয়ার কলিজাটা কেমন ছিল বলেন তো ? ই কোন মানুষের কাজ। লোভ সামাতে পারে নাই, বাণ মেরেছে।

ডাক্তার হেসে বললেন, এ তো খাবার জিনিস নয় যে, লোভ হবে নাদের !

নাদের বললে, দেখেন দেখি, বলছেন কি আপনি ? যার ভিতরে রস আছে, তার উপরেই মানুষের লোভ হয়। এই আপনার বেশ একটি মোটা-সোটা চোখ-জুড়োনো ছেলে দেখেন দেখি, ছেলেটির 'পরে আপনার লোভ হবে, মনে হবে, বেশ ক'রে নেড়ে ঘেটে কোলে লিই। যাদের লোভ বেশি তাদের মনে হবে, খাই। মানুষের মাস তো মানুষে খায় না, তবু তার জিভ দিয়ে জল সরবে।

ডাক্তার বললেন, না না, নাদের, ওসব কিছু নয়, ভেতরে উই-টুই লেগেছে কিংবা ইঁদুরে কেটেছে।

নাদের বার বার অস্বীকার ক'রে বললে, না আজ্ঞা। ই মানুষে বাণ মেরেছে।

ডাক্তারের বন্ধুটি বললেন, বেশ তো, তুমিও তো অনেক রকম জান, বাঁচাও না গাছটাকে।

নাদের বললে, বাবু ডাক্তার, তাই ব'লে কি মরা মানুষ বাঁচাতে পারে ? সময় থাকলে দেখতাম বইকি।

ডাক্তার বললেন, যাক গে ওসব কথা। তারপর এসেছিলে কোথা ?

নাদের বললে, একবার আমার বাড়ি যেতে হবে আজ্ঞা। আমার এক লাতির বড় অসুখ।

ডাক্তারের বন্ধুটি বললেন, বাণ-টান নয় তো হে, সে ভাল ক'রে দেখেছ ?

নাদের ব্যঙ্গটা বুঝতে পারলে, সে স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে

বললে, হুজুর, আপনারা হলেন ভদ্দর লোক, মুরুব্বি লন, বিদ্যাকে এমন ক'রে ঠাট্টা করতে নাই, বুঝলেন।

ডাক্তারের বন্ধুটি হয়তো আরও কিছু বলতেন, কিন্তু ডাক্তার কথাটা চাপা দিলেন, বললেন, কি হয়েছে তোমার নাতির? কত বয়েস?

বছর পাঁচেক হবে আজ্ঞা। জ্বর হয়েছে, বুকে বেদনা, আবোল-তাবোল বকছে।

বেশ, যাব। কখন যেতে হবে?

ই বেলা তো আজ্ঞা আমি একবার দোনাইপুর যাব, উ বেলা ঘুরবার পথে আপনাকে লিয়ে যাব।

ডাক্তার বললেন, যদি তোমার নাতিকে দেখতেই হয় নাদের, তবে এ বেলাতে যাওয়াই ভাল। দেরি করা ভাল নয়।

নাদের যেন চিন্তিত হয়ে পড়ল।

ডাক্তার আবার বললেন, কোন জরুরী কাজ আছে নাকি?

আজ্ঞা হাঁ। আমার আবার একটি রুগী আছে—সাপে-কাটা রুগী। বাড়ি থেকে বেরিয়ে তো আর ঘুরতে নাই। তা ছাড়া ধরেন, ওস্তাদের আজ্ঞা হ'ল এই, খেতে খেতে শুনলে খাওয়া ফেলে উঠতে হবে।

ডাক্তারের বন্ধু বললেন, ডাক্তারবাবুর ওস্তাদেরও তেমন আজ্ঞা তো থাকতে পারে নাদের। আর দেরি করলে রোগও বাড়বার সময় পায়।

নাদের হেসে বললে, সে হ'লে আর আমাদের ভাবনা কি ছিল বাবু!

ডাক্তার লজ্জিত হয়ে পড়লেন। কথাটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অভিযোগটুকু তাঁর অস্বীকার করবার উপায় নাই।

নাদের একটু ভেবে বললে, তবে না হয় আপুনি গাড়ি হাঁকিয়ে চ'লেই যান ডাক্তারবাবু। আমি বরং ভিজিটটা দিয়ে যাই। বাড়িতে আমার ছেলে আছে, আর আমার বাড়ি তো আপনি চিনেন! আমিও ইদিকে রুগীটা দেখে আসি।

সে ডাক্তারের হাতে দুটি টাকা দিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালে। নাদেরের একটি পা একটু দুর্বল, খুঁড়িয়ে পা টেনে টেনে চলতে হয় তাকে। দুর্বল পাখানি টেনে তুলতে গিয়ে সে আবার দাঁড়াল, বললে, আপনারা বলছেন বাণ-টান সব মিছা কথা; তা দেখেন, আমার এই পা দেখেন; চিরজনম টেনে টেনে চলছি।

ডাক্তার বললেন, ও কি তোমার বাণ মেরে খোঁড়া ক'রে দিয়েছে না কি?

ধীরে মৃদুস্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সে বললে, আজ্ঞা হাঁ। বাণ মেরে মানুষের জান সুদ্ধা মেরে দিতে পারে···আচ্ছা, সে আর একদিন বুলব আজ্ঞা। সাপে-কাটা রুগী, বুঝলেন তো, শিয়রে যম এসে ব'সে আছে।

* * *

সন্ধ্যার ঠিক আগেই নাদের আবার এসে হাজির হ'ল!

ছেলেটাকে দেখে এসেছেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার হেসে বললেন, হ্যাঁ, ভাল আছে তোমার নাতি, কোন ভয় নাই। তারপর, তুমি কি এই ফিরছ না কি?

নাদের ডাক্তারের সামনে উপু হয়ে ব'সে বললে, পথে পথে আসছি আজ্ঞা। সমস্ত দিন 'ঝাড়ন' করতে হ'ল। বিষ একেবারে মগজে উঠেছিল।

ডাক্তার উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলেন, বাঁচল তো?

নাদের ঘাড় নেড়ে চিন্তিতভাবেই বললে, বেঁচেছে। তবে চিতির বিষ তো, বড় পাজি বিষ, ধিকি ধিকি তুষের আগুনের লহরের মত সহজে নিবতে চায় না। আবার হয়তো সাত দিন বাদে বিষ দেখা দিবে।

ডাক্তার আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন ওষুধ-টষুধ দিলে, না, মন্তর-তন্তর প'ড়ে ঝাড়-ফুঁকই করলে?

সব রকমই করলাম বাবু। সাপের বিষ, ও হ'ল যমের অগ্নিবাণ,

ও কাটা কি সোজা কথা ! ওষুধ দিলাম, মাথার চামড়া চিরে মুরগীর বাচ্চা লাগালাম, পদ্মের ডাঁটি দিয়ে ঝাড়লাম, শেষ করলাম 'জলসার', এক শো আট ঘড়া জলে চান করালাম রুগীকে।

ডাক্তার ভাবছিলেন, এদের ওষুধ জেনে নিয়ে তার থেকে একস্‌ট্রাক্‌ট্‌ বের করলে কেমন হয় ! নাদেরের কথা শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি সেই কথাই ভাবছিলেন।

নাদের একটুক্ষণ ডাক্তারের উত্তরের প্রতীক্ষা করলে, তারপর বললে, কাঁউরের বিদ্যা—উটি তো আর মিছা নয় ! কিন্তু আপনারা বিশ্বেস করেন নাই কেন বুলেন তো ?

ডাক্তার বললেন, কে বললে আমি বিশ্বাস করি না ? তোমাদের সাপের ওষুধ আমাকে শেখাবে ?

নাদের বললে, না আজ্ঞা, আপনারা বিশ্বাস করেন না, ই আপনার মুখ দেখে বুঝছি আমি। দেখেন, আগে সব এমন বিদ্যা ছিল,—লোকে গাছের ওপর ব'সে গাছ আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যেত। আমাদের গাঁ ঢুকতে একটা কি রকম তাজ্জব গাছ আছে দেখেছেন, উ গাছ আমাদের দেশের লয়। কাঁউরের গাছ। এক ডাকিনী ঐ গাছ উড়িয়ে নিয়ে যেছিল, আমাদের গাঁয়ে ছিল রমজান ওস্তাদ, সে নামিয়ে ফেলালে গাছ। লোকে অবাক হয়ে দেখলে, এক বহুৎ খুবসুরৎ মেয়ে সে গাছে চ'ড়ে রয়েছে, কিন্তু তার গায়ে এক টুকরা কাপড় নাই। বিবি নেমেই বললে—আমি মেয়েমানুষ, আমাকে কাপড় দাও, নইলে দাঁড়াই কি ক'রে তোমাদের ছামনে ? ওস্তাদ তাড়াতাড়ি আপন চাদরখানা দিলেক বিবিকে। বিবি সেটা নিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে ফেলালে। তারপর বুঝলেন, পায়ের দিক থেকে কাপড়খানা তুলে মাথা পার ক'রে ফেলে দিলেক। সঙ্গে সঙ্গে, কি বুলব, ওস্তাদের পায়ের দিক থেকে চামড়া কে যেন মাথা পার ক'রে টেনে খুলে দিলেক—

বাধা দিয়ে ডাক্তার বললেন, ও-সব বাজে কথা। তুমি পার, তুমি জান এ বিদ্যে? গাছ আকাশে তুলতে পার?

নাদের বললে, তবে আর বুলছি কি বাবু! এমন বিদ্যাও দেশে ছিল। সব হারায়ে গেল ডাক্তারবাবু। দেখেন, আগে লোকে বিদ্যার জোরে জানোয়ার বানিয়ে ফেলাত লোককে।

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন, বললেন, তোমার তো সারাদিন খাওয়াদাওয়া হয় নি নাদের, সন্ধ্যে হয়ে এল, এখন বাড়ি যাও। এখনও তোমাকে ক্রোশ দেড়েক হাঁটতে হবে।

নাদের অপ্রতিভের মত বললে, তা বটে আজ্ঞা।

সে উঠে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, সাপের বিদ্যেটা শিখবেন, বুললেন না?

ডাক্তার বললেন, না, নাদের, ওতে আমার দরকার নাই। তুমি এস আজ, আমার কাজ আছে, আমি উঠছি।

নাদের খোঁড়াতে খোঁড়াতে পথ ধরল।

* * *

যত তাড়াতাড়ি নাদেরের নাতিটি আরাম হয়ে যাবে ব'লে ডাক্তার ভেবেছিলেন, তত তাড়াতাড়ি সে সেরে উঠল না। রোগের কঠিন অবস্থা অবশ্য পার হয়ে গিয়েছে, বুকে প্লুরুসির আর কোন অস্তিত্বও নেই। কিন্তু ছেলেটির অল্প অল্প জ্বর আর খুসখুসে কাশি লেগেই আছে। ডাক্তার ক্রমশ সন্দিহান হয়ে উঠছিলেন। এখনও অবশ্য সঠিক কিছু বুঝতে পারেন নাই, তবু তাঁর চিন্তার মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সপ্তাহে একদিন তাঁকে নাদেরের বাড়ি যেতে হয়।

সেদিন তিনি নাদেরের বাড়ি থেকেই ফিরছিলেন, তাঁর ছোট ঘোড়াটি ঠুক ঠুক ক'রে আস্তে আস্তেই চলছিল, তবুও খোঁড়া নাদের অনেকখানি পিছিয়ে

পড়েছিল। বৈশাখের বিকালে রৌদ্রের তেজ ক'মে এলেও গরম বাতাসে চোখ মুখ জ্বালা করছিল। পথের দুই ধারে শূন্য মাঠ। মধ্যে মধ্যে ছোট ঘূর্ণি ধুলা উড়িয়ে ছুটে চলেছে।

যেতে যেতেই ডাক্তারের চোখে পড়ল, একটি মেয়ে মাঠের মধ্যে ছুটে চলেছে, সে যেন কিছু তাড়া ক'রে ছুটেছে। বেশ ভাল ক'রে দেখে ডাক্তার বুঝতে পারলেন না, সে কিসের পিছনে ছুটে চলেছে। তিনি একবার নিজের বাহনটিকে তাড়া দিলেন। উচ্চৈঃশ্রবার বংশধর কিন্তু নাকঝাড়া দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। ডাক্তার বিরক্ত হয়ে সরু কঞ্চির ছড়িখানা দিয়ে সপাসপ কয়েক ঘা ক'ষে দিলেন, ঘোড়াটা এবার তালে বেতালে ছুটতে আরম্ভ করলে—কখনও দুলকি চালে, কখনও ছার্তকে। মেয়েটির কাছাকাছি এসেই ডাক্তার সভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ঘোড়াটার লাগাম টেনে ধরলেন। সামনেই কিছু দূরে প্রকাণ্ড একটা কালো কেউটে সনসন ক'রে ছুটে চ'লে আসছে, আর মেয়েটা ঐ সাপটাকেই তাড়া দিয়ে ছুটে আসছে। সামনে বাধা পেয়ে সাপটা ক্রুদ্ধ বিক্রমে গর্জন ক'রে ফণা তুলে দাঁড়াল; মেয়েটা তখন তার পিছনে এসে পড়েছে। সাপটা ছোবল মারবার আগেই সে সাপের চেয়েও ক্ষিপ্র গতিতে আপনার হাতের সরু একগাছা লাঠি দিয়ে সাপটার উদ্যত ফণা মাটিতে চেপে ধরলে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাতে লেজের প্রান্ত চেপে ধ'রে বিজয়িনীর মত বললে, বড় ছুটাইলি আমাকে! মনে করেছিলি, পালায়ে বাঁচবি। তুইও বটি কাল, আর আমি বটে বেদের মেয়ে, হুঁ!

ডাক্তার ঘোড়ার পিঠের উপর ব'সে শুদ্ধ বিস্ময়ে বেদেনীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

লাঠির নীচে চাপা প'ড়েও সাপটা বার বার হাঁ ক'রে যেন বাতাসকেই কামড়াচ্ছিল।

অকস্মাৎ বেদেনী যেন চিন্তিত হয়ে পড়ল। একবার এদিক

ওদিক দেখে সে ডাক্তারের দিকে চেয়ে বললে, একটি কাজ ক'রে দিবে বাবু?

ডাক্তার বললেন, তুই আগে সাপটা সামলে ফেল্ বাপু।

মেয়েটা সকৌতুকে হেসে বললে, তারই তরে তো বুলছি গো বাবু আমার পিঠের বাঁধা ঝাঁপিগুলা খুলে দিতে পার?

ডাক্তার সভয়ে বললেন, ওতে সাপ নেই তো তোর?

বেদেনী বললে, আছে, তবে সবগুলাতে নাই।

ডাক্তার বললেন, তবে আমি পারব না।

অকস্মাৎ তাঁর নাদেরের কথা মনে প'ড়ে গেল, তিনি বললেন, দাঁড়া, দাঁড়া লোক আসছে।

লোক ততক্ষণে এসে পড়েছিল, নাদের অল্প দূরে থেকে সব দেখে ব'লে উঠল, বাহা, বাহা, তুই আচ্ছা বাহারের লতা ধরেছিস গো!

ডাক্তার বললেন, চট ক'রে ওর পিঠ থেকে ঝাঁপির বোঝাটা খুলে দাও নাদের।

নাদের হেসে বললে, খইয়ে বন্ধনে পড়েছিস গো! আচ্ছা, সাপটা আমাকে ছেড়ে দে, তুই ঝাঁপি খুলে ফেল্।

বেদিনী নাগিনীর মত ফোঁস ক'রে উঠল, আমি সাপ তুকে ছেড়ে দিব কেঁনে? দিবি তো ঝাঁপি খুলে দে, লইলে স'রে যা, আমি ব্যবস্থা ক'রে লিব।

নাদেরও উষ্ণভাবে বললে, তুই মেয়েলোক, আমি মরদ, সাপ ফেলে আমি ঝাঁপি খুলতে যাব কেনে?

বেদেনী বললে, তবে স'রে চল তুমি।

নাদের এবার মিষ্টি স্বরে বললে, আঃ, রাগ করিস কেনে গো! আমার সাথে মিতালি ক'রে লে, তা হ'লে তুর আর গোল থাকবে না।

বেদেনী বললে, কুথাকার মানুষ গো তুমি, মেয়েলোক মিতালি আগে করে, না, মরদে আগে করে গো?

নাদের এবার অপ্রস্তুত হয়ে গেল, অপ্রতিভের মত হেসে বললে, কসুর হয়েছে গো, ঘাট মানছি। বেশ, আজ থেকে তুমি আমার সই হ'লে গো।

বেদেনী হাসল, হেসে বললে, বেশ গো বেশ, তুমি আমার সয়া হ'লে, ভগবানের দয়া! বেশ গো সয়া, আমার পিটের ঝাঁপিটা খুলে দাও তো।

নাদের আবার অপ্রতিভের মত বেদিনীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বেদেনী খিলখিল ক'রে হেসে বললে, বলি, সয়ার আবার হ'ল কি?

নাদের মৃদু হেসে বললে, সই আমার বড় চতুর।

ব'লে সে বেদেনীর পিঠের ঝাঁপি খুলতে আরম্ভ করল। ডাক্তার ঘোড়ার পিঠে ব'সে অভিভূত হয়ে অজ্ঞাত ভাব-জগতের দুটি মানুষের কার্যকলাপ দেখছিলেন। নাদের বেদেনীর পিঠে বাঁধা ঝাঁপিগুলা খুলে একটা শূন্য ঝাঁপি তার সামনে পেতে দিতেই বেদেনী বাঁ হাতে লেজটা ধ'রে সাপটাকে শূন্যে তুলে ধরলে। মর্যাদাহত নাগিনী বিপুল গর্জনে মুখ ঘুরিয়ে আপনার দেহে দেহে জড়িয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই বেদেনী নির্মমভাবে কয়েকটা ঝাঁকি দিয়ে তার মাথা নামিয়ে দিলে। ঝাঁপির মধ্যে সাপটাকে পুরে বেদেনী বললে, বড় কষ্ট দিলেক উ আমাকে। হুই হোথা থেকে ছুটছি পিছে পিছে।

এতক্ষণে ডাক্তারের মুখে কথা ফুটল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় বাড়ি তোমার?

মেয়েটি উত্তর দিলে, বড়োঞা থানা, গাঁ বগতোর বাবু। আমরা বেদের মেয়ে।

এখানে কোথায় এসেছ?

আজ্ঞা, আমাদের দল বার হয়েছে বাবু, আমরা যাব মেদিনীপুর বিষ বেচতে।

বিষ বেচতে? কিনবে কে?—ডাক্তার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন।

উত্তর দিলে নাদের, আপনারাই লিবেন।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা প্রশ্ন করলে, আপনি কোবরেজ?

ডাক্তার বললেন, আমি ডাক্তার।

বেদেনী বললে, ডাক্তারেরা বিষ লেয় না, কোবরেজরা লেয়। এ থেকে যে ওষুধ হয় বাবু, সে ওষুধে মরণ-দশার রোগী চাঙ্গা হয়। তোমাদের এমন নাই।

ডাক্তার বললেন, জানি, কিন্তু এই বিষ বেচতে তোরা মেদিনীপুর যাবি। সে যে অনেক দূর!

বেদেনী বললে, পথে পথে সাপ ধরতে ধরতে চ'লে যাব আমরা। এই বছরের পেরথমে বার হলাম, ফিরব সেই আশ্বিন মাসে।

অকস্মাৎ ডাক্তারের খেয়াল হ'ল, অকারণ দেরি হয়ে যাচ্ছে, তিনি ঘোড়ার লাগাম টেনে বললেন, আচ্ছা, এস নাদের।

নাদের বললে, গাঁয়ের ভিতরকে চল গো সই। বাবুকে খেলা দেখাবে। শিরোপা একটা মিলে যাবে।

বেদেনীও সাপের ঝাঁপি পিঠে তুলে বললে, মোটা ইলেম লিব আজ বাবুর কাছে, গিন্নীর কাছে লিব একখানা লালপেড়ে শাড়ি।

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে বললেন, না না, ওসবে কাজ নাই! ওসব সাপ নিয়ে—

মেয়েটা খিলখিল ক'রে হেসে ডাক্তারে কথা ঢেকে দিলে। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ডাক্তার মুখ ফিরিয়ে নিতেই বেদেনী তার স্বাভাবিক মধুর বিনয়ের সঙ্গে বললে, আপনারা বিমুখ হ'লে আমরা বাঁচব কেন বাবু? আর সাপ ধরা আমাদের জাত-ব্যবসা। কিছু ভয় নাই আপনার।

ডাক্তার আর 'না' বলতে পারলেন না। খানিকটা কৌতূহলও হ'ল তাঁর।

* * *

ডাক্তারের ডাক্তারখানার উঠানে বেদেনী সাপের ঝাঁপি নামিয়ে আবার

বললে, ঘোটা ইলেম লিব আজ বা[illegible]াছে, গি[illegible]ছে লিব [illegible]পেড়ে শাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে সে তাদের নিজস্ব সুর-[illegible] গান ধরলে—

যেমন গিন্নী চাঁদবদনী তেমনি শাড়ি লিব গো!—

ঝাঁপির সঙ্গে দড়িতে বাঁধা বিষমঢাকিটা খুলে নিয়ে নাদের তাতে আঙুলের আঘাতে তালে তালে ঝঙ্কার তুললে। বেদেনী গ্রামে ঢুকতেই কতকগুলি ছেলে আর কয়েকজন লোক পিছু নিয়েছিল। এখন আবার বিষমঢাকির শব্দে লোক জমতে আরম্ভ হ'ল। ডাক্তারেরও ক্রমে ক্রমে নেশা ধ'রে আসছিল, তিনিও কতকটা সমারোহ আরম্ভ ক'রে দিলেন, নিজে উপরে গিয়ে মেয়েদের জানলায় বসিয়ে দিয়ে এলেন; কয়েকজন বন্ধুকেও ডেকে পাঠালেন।

ডাক্তার অনুমতি দিতেই বেদেনী হাতের লাঠিটা নিয়ে গান আরম্ভ করলে—

ও কালিদহে ঝম্প দিল কে?

সাজ সাজ নাগিনী লো, খোল বিষের ঘরের চাবি—

নাদেরের হাতে বিষমঢাকির চর্মাচ্ছাদনী ধনুকের টঙ্কারের মত হুঙ্কার তুলে বাজছিল, ঝাঁপির ঢাকনি খুলে দিতেই সত্যবন্দী সাপটা ক্রুদ্ধ গর্জনে উন্মত্তের মত মাথা তুলে বিদ্যুৎচমকে ঝাঁপি থেকে বেরিয়ে বেদেনীকে ছোবল মারবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু বেদেনী চঞ্চল হ'ল না। খুব সহজভাবে সে হাতের ঝাঁপির ঢাকনিটা ঢালের মত ক'রে সাপটার আক্রমণ প্রতিহত ক'রে গাইতে লাগল—

মাথায় মানিক পরি কেশ বান্ধিলে

ও নাগিনী, কালিদহে ঝম্প দিল কে?

একের পর এক সাতটা সাপ বের ক'রে খেলা দেখিয়ে সর্বশেষ সাপটাকে বন্দী ক'রে বেদেনী উপরের জানলার দিকে তাকিয়ে বললে,

সাপের মাথার এঁটুলি দিব গিন্নীমা, এক জোড়া শাঁখা দিতে হবে বেদেনীকে।

বেদেনীর দাবি ক্রমশ বাড়ছে দেখে এবার ডাক্তার একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তাড়াতাড়ি একটা আধুলি বেদেনীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, না না, ওসব এঁটুলি-ফেঁটুলিতে কাজ নাই। অনেক দিয়েছি, বাড়ি যা এখন।

বেদেনী হাসতে হাসতে বললে, আপনার কাজ নাই, গিন্নীমায়ের আছে। ই বলে কেমন জিনিস, সাপের মাথার কাঁচা মণি!

ব'লে সে আধুলিটা কুড়িয়ে নেবার উদ্যোগ করতে লাগল।

কিন্তু নাদের একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসল। সে এক মুঠো ধুলো হাতে নিয়ে বেদেনীকে বললে, উঠা তুমি লিবে কি আমি লিব বিচার হয়ে যাক সই, তবে তো লিবে।

জ্যা-মুক্ত ধনুকের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বেদেনী ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললে, কি বঁলছ তুমি?

নাদের বললে, দেখাইয়া দাও বাবুদিগে 'তুমড়ির খেলা'টা; বাবুরা বিশ্বাস করে না, হাসে। তাতেই বুলছি। আমি তোমার সয়া, তুমি আমার সই, ঝগড়া তোমার সাথে নাই।

বেদেনীর মুখে এবার হাসি দেখা দিল. সে কোমরে কাপড় জড়িয়ে বললে, বশকিশ তো আমার, বাবু তো আমাকে দিলেক। পার তো তুমি উঠায়ে লাও। আমার জিনিস আমি রাখতে পারি তো আমার, না হ'লে তুমার।

নাদের গায়ের জামাটা খুলে ফেললে। বেদেনীও হাতে এক মুঠো ধুলো নিয়ে আধুলিটার চারি পাশে ঘুরে ঘুরে আপন মনে বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র আওড়াতে লাগল।

অভিনব কৌতুকের আশায় দর্শকের দল নিস্তব্ধ হয়ে উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ডাক্তার ও তাঁর বন্ধুর দল আবার চেপে বসলেন।

আধুলিটাকে প্রায় মাঝখানে রেখে নাদেরের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে বেদেনী বললে, নাও সয়া, পার তো উঠায়ে লাও বশকিশ !

নাদের হাতের মন্ত্রপূত ধুলা গায়ে মেখে আধুলিটার দিকে এগিয়ে গেল। সে আধুলিটা তুলে নেবার জন্য নত হবামাত্র বেদেনী তার হাতের ধুলার মুঠি সজোরে নাদেরের মুখের উপর ছুঁড়ে মারলে।

সামনে থেকে পিছনের দিকে মানুষকে ঠেলে দিলে যেমন উল্টে পড়ে, তেমনই ভাবে দুই হাতে মুখ ঢেকে নাদের উল্টে প'ড়ে গিয়ে বললে, উঃ, মুখে মারলি গো সই, মুখে মারলি !

বেদেনী কোন উত্তর দিল না, সে আবার এক মুঠো ধুলা নিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে আধুলিটার চারিদিকে ঘুরতে লাগল। তার চোখ দুটি স্তিমিত, দৃষ্টির মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রখরতা ফুটে উঠেছে, মুখের মাংসপেশী কঠিন, দাঁতে দাঁতে চেপে মন্ত্রোচ্চারণ করায় কেবল ঠোঁট দুটি অতি দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছিল।

নাদের ধীরে ধীরে যেন আপনাকে সামলে নিলে। তারপর আবার এক মুঠো ধুলা নিয়ে বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করলে।

আবার সে অগ্রসর হ'ল, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বেদেনী স্তিমিত দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করছিল। তার আঁকাগণ্ডির সীমারেখার ধারে নাদের এগিয়ে যেতেই সে হাতের ধুলার মুঠি আবার ছুঁড়লে। কিন্তু তার আগেই নাদের নিজের হাতের ধুলার মুঠো বেদেনীর উপর ছুঁড়ে ব'লে উঠল, নিজেকে সামাল করিস বেদেনী।

নাগিনীর চেয়েও ক্ষিপ্রগতি বেদেনীর, মুহূর্তে সে এক পাশে স'রে দাঁড়িয়ে নিজের হাতে ধুলার মুঠি দিয়ে নাদেরকে প্রহার করলে। নাদের আবার প'ড়ে গেল, বেদেনীও কিন্তু টাল না খেয়ে পারলে না, নাদেরের ধুলার প্রহার থেকে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা করতে পারে নাই।

উপরে যারা ব'সে ছিল, তাদেরই মধ্যে একজন হাসছিল। আর একজন

বললে, দূর, দূর, ন্যাকামি আর ভণ্ডামি। ডাক্তার, তুমি সেই বর্বর যুগে চ'লে গেছ।

বেদেনী তখন এদিকে ওদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে কি দেখছিল। নাদের তখনও সম্পূর্ণভাবে আত্মসম্বরণ করতে পারে নাই, অন্তত তেমনিভাবে সে মাথা হেঁট ক'রে ব'সে ছিল। বেদেনী দ্রুতপদে ডাক্তারের বাগানের মধ্যে একটা জায়গা লক্ষ্য ক'রে সেদিকে চ'লে গেল। বাগানের কোণে একটা প্রকাণ্ড মধুমালতী লতার জঙ্গল, সেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে অল্পক্ষণ পরেই সে আবার বেরিয়ে এল।

নাদের উঠে দাঁড়িয়ে আবার ঘুরতে আরম্ভ করলে। বেদেনী স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারই অপেক্ষায়। নাদের চিহ্নিত গণ্ডির দিকে এগুতেই বেদেনী ব'লে উঠল, বুঝে-সুঝে এগুবে সয়া।

নাদের বললে, ভ্যালা গো আমার সই, দু-দুবার বুঝলাম, এবারও বুঝব বইকি!

কিন্তু তবে ভালবাসার মধু—

মুহূর্তে সে তার মুষ্টিবদ্ধ বাণ নাদেরের উপর নিক্ষেপ করলে।

নাদের কিন্তু এবার পড়ল না, সেও আপনার হাতের ধূলিমুষ্টি বেদেনী উপর মারলে। নাদের ছুঁড়েছিল বেদেনীর গতি লক্ষ্য ক'রেই। বেদেনীও এবার মুখ ঢেকে ব'সে পড়ল। নাদের এবার সঙ্গে সঙ্গেই বিচলিত হয় নাই, কিন্তু দুই তিন মুহূর্ত পরেই সে আর্তনাদ ক'রে লাফ দিয়ে উঠল—আরে বাবা রে, এ কি মারলি গো—আরে বাপ রে!

শুধু নাদের নয়, নাদেরের পাশেই অতিমাত্রায় কৌতূহলী একটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল, সেও একটা আর্তনাদ ক'রে ব'সে পড়ল। দর্শকদলও শঙ্কায় চঞ্চল হয়ে স'রে যাচ্ছিল।

মাথার উপরে ভনভন ক'রে মৌমাছি উড়ছে। নাদেরের সর্বাঙ্গ মৌমাছিতে ছেঁকে ধরেছে। ঐ ছেলেটার মাথাতেও কয়েকটা কামড়ে ধ'রে

আছে। লাফ দিতে দিতে নাদের আপনার দেহ থেকে মৌমাছিগুলো ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। ডাক্তার তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে উঠিয়ে এনে তার মাথা থেকে মৌমাছিগুলো ছাড়িয়ে দিলেন। তার মাথায় বেশি ছিল না, ছিল অল্প দু-চারটেই।

বেদেনী তখন আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। সে নাদেরকে ডেকে বললে, উঠ গো সয়া, ভালবাসার মধুতে যে বেঁহুশ হ'লে গো!

ডাক্তার বললেন, না, এসব আবার কি, থাক্, আর খেলতে হবে না।

* * *

ডাক্তার ও তাঁর বন্ধু কজন সবিস্ময়ে শুনছিলেন। নাদের আর বেদেনী ব'সে ঐ খেলার কথাই বলছিল।

নাদের বললে, ই আর আজ্ঞা কি দেখলেন! হুকুম করেন তো দেখাই কাঠ-পিঁপড়া, মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল মারামারি হবে একে একে।

বেদেনী বললে, কাল-কেউটেও মারে বাবু, তবে মিস্তেলির খেলাতে সে বারণ আছে।

অকস্মাৎ ঘরের বারান্দা কার খড়মের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল। পর-মুহূর্তেই ঘরে এসে ঢুকলেন গ্রামের জমিদার মহাদেববাবু। বললেন, কই, সে হারামজাদী কই? এই যে! হারামজাদী, পাজী, আমার ছেলেকে বাণ মার তুমি! হারামজাদী!

বলতে বলতে তিনি বেদেনীর চুলের মুঠি ধ'রে টান মেরে ফেলে দিয়ে খড়মসুদ্ধ পা দিয়ে তাকে লাথি মারতে আরম্ভ করলেন। অত্যন্ত অতর্কিত অপ্রত্যাশিত আক্রমণ, মুহূর্তের জন্য সকলে হতভম্ব হয়ে গেল। পর-মুহূর্তে ডাক্তার মহাদেববাবুকে ধ'রে ফেললেন, বললেন, করেন কি মহাদেব-বাবু, স্ত্রীলোক—মেয়েমানুষ—

মহাদেববাবু পাগলের মত চীৎকার ক'রে উঠলেন, আমি জমিদার, আমার ছেলেকে বাণ মারে হারামজাদী আমারই রাজ্যে এসে?

ডাক্তার এবার উষ্ণভাবে বললেন, তা ব'লে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলবার অধিকার আপনার নাই—বিশেষ আমার ঘরে অনধিকার-প্রবেশ ক'রে।

মহাদেববাবু ডাক্তারের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে যেমন রাগের সঙ্গে এসেছিলেন, তেমনই খড়ম খটখট করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

তাঁরই ঘরের মধ্যে একজন অসহায়া স্ত্রীলোকের উপর এমনই ধারার নিষ্ঠুর ও ঘৃণ্য আক্রমণ হওয়ার জন্য ডাক্তারের মনে গ্লানির আর শেষ ছিল না।

তিনি নিজে তাড়াতাড়ি বেদেনীকে তুলতে গেলেন। কিন্তু বেদেনী তার আগেই আপনার বেশবাস সম্বৃত ক'রে নিয়ে বললে, আপনার দোষ কি বাবু!

নাদের ব'সে ছিল মাথা হেঁট ক'রে, সে বললে, দোষ আমার আজ্ঞা; আমিই উকে ডেকে আনলাম।

বেদেনী বললে, হাঁ, দোষ তোমার, তুমিই দায়িক।

নাদের উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমিই দায়িক।

ডাক্তার চুপ ক'রে ভাবছিলেন, একটা মামলা ক'রে দিলে কেমন হয়?

বেদেনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে একটা পোকা ডাক্তারের সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে, মাদুলী ক'রে ধারণ করবেন বাবু, কেউটের মাথার এঁটুলি—কাঁচা মানিক।

ডাক্তার প্রত্যাখান করলেন না, সেটি হাতে তুলে নিয়ে বললেন, তুমি একটা মামলা কর, আমি সব খরচ দেব।

বেদেনী শুধু বললে, না বাবু।

ডাক্তার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, তারপর একটি টাকা বের ক'রে বেদেনীকে দিয়ে বললেন, আর বেশি পারলাম না। তুমি কিছু মনে ক'রো না।

বেদেনী ডাক্তারকে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে ডাক্তার ডাকলেন, নাদের!

বেলা প'ড়ে এসেছে, নাদেরকে তার নাতির ঔষধটা দিয়ে বিদায় করতে হবে। কিন্তু তাঁর ডাকের কোন সাড়া এল না। ডাক্তার বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন, নাদের নাই। মালীটা বাগানে জল দিচ্ছিল, তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন, নাদের ছিল, কোথায় গেল রে?

মালীটা মধুমালতীর গাছটার দিকে তাকিয়ে ছিল, সে উত্তর দিলে, মৌমাছির চাকটা থাবলে ছাড়িয়ে নিয়েছে বাবু।

* * *

গ্রামের প্রান্তে মাঠে নাদের তখন বেদেনীর কাছে বিদায় নিচ্ছিল। সে বললে, এ জুতা আমার মাথায় পড়েছে সই, ইয়ার জবাব আমি দিব।

রাগে বেদেনীর ঠোঁট দুইটা কাঁপছিল, সে বললে, ঐ পা দুটা আর হাত দুটা—

* * *

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। গাঢ় অন্ধকারে অবলুপ্ত মাঠের মধ্যে নাদের ছোট্ট একটা উনানে আগুন জেলে সরার মধ্যে কি পাক করছিল। উনানের স্বল্প আলোর প্রভায় দেখা যাচ্ছিল, তার সামনে রয়েছে খানিকটা বালি, কিছু কাঁটা, একটা মরা সাপের কঙ্কাল, একটা কাগজের উপরে কাঁকড়া বিছার হুল।

নাদেরের নাকে একখানি ন্যাকড়া বাঁধা। সে উপকরণগুলি একটির পর একটি সরায় ফেলে দিচ্ছিল। সে বাণ তৈরি করছে।

কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। জীবনে কখনও সে এই অর্জিত শক্তির পরীক্ষা করে নাই, এবার তার পরীক্ষা হবে। তবে তার সংশয় নাই, তার ওস্তাদের চেয়ে বড় ওস্তাদ এ চাকলায় কেউ ছিল না। তিনি অতি গোপন বিদ্যা তাকে দিয়ে গেছেন।

নাদের অস্থির হয়ে উঠল। তার মনে প'ড়ে গেল, ওস্তাদ যেদিন তাকে

এই গোপন বিদ্যার প্রথম পাঠ দিয়েছিলেন সে দিনের কথা।—এ বিদ্যা বড় কঠিন বিদ্যা বেটা! ছেলের হাতে লাঠি যেমন দিতে নাই, যাকে তাকে এ বিদ্যাও তেমনই দিতে নাই। ইয়াতে মানুষের জান্ চ'লে যায়। বাঘের মত জোয়ানকে বিছানায় পেড়ে ফেলা যায়।

নাদের এক দৃষ্টিতে সরাটার দিকে চেয়ে রইল, নাকের কাপড় ভেদ ক'রেও তীব্র গন্ধে তার বুকটা কেমন করছে, সরাটার উপর থেকে এঁকে-বেঁকে ধোঁয়া উঠছে খেলায় মত্ত সাপের ছানার মত। এ বাণ ছাড়লে আর রক্ষা নাই।

কিন্তু—

ওস্তাদ শেষ দিন তাকে বলেছিলেন, আমার পা ছুঁয়ে হলপ কর নাদের, এ বিদ্যা তুমি মানুষের উপর কখনও হানবে না।

নাদেরের মনে পড়ল, সে বলেছিল, তবে শিখালেন কেনে ওস্তাদ?

যদি অপরে কেউ কারও ক্ষতি করে বেটা, তবে তুমি তাকে বাঁচাবা। তাথেই শিখালাম তোমাকে। বিষের ওষুদ শিখতে গেলে বিষও চিনতে হয়।

নাদের চঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। বহুক্ষণ সে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। অকস্মাৎ তার মনে হ'ল, যেন তার কোলের কাছে অন্ধকার অত্যন্ত গাঢ় হয়ে উঠেছে। প্রসারিত দৃষ্টি সংবরণ ক'রে সে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলে, উনানের আগুন নিবে গেছে। সে তাড়াতাড়ি সরাটা নামিয়ে ফেললে। এইবার ঐ চূর্ণ হাতের তালুতে নিয়ে মন্ত্রপূত ক'রে ঐ জমিদারের উদ্দেশে বাতাসে ছুঁড়ে দিতে হবে। তার মন যেন স্মৃতি আলোড়িত ক'রে মন্ত্রগুলো উচ্চারণ ক'রে চলল।

বার বার সে মনে মনে ঠিক করলে, না, সে মন্ত্র উচ্চারণ করবে না। কিন্তু বুকের মধ্যে মন যেন ঐ মন্ত্র ছাড়া কিছু ধ্যান করতে চায় না। সে

শিউরে উঠল। সে তাড়াতাড়ি একটা গর্ত খুঁড়ে সরাখানা পুঁতে ফেলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

* * *

দিন তিনেক পর খুব সকালেই নাদের ডাক্তারের ওখানে এসে হাজির হ'ল। ডাক্তার তাকে দেখে চমকে উঠলেন, বললেন এ কি নাদের, তোমার অসুখ করেছে ?

নাদের ব'সে হাঁপাচ্ছিল। তার অতি যত্নের বাবরি চুল রুক্ষ বিশৃঙ্খল, চোখ দুটো করমচার মত রাঙা, সে যেন একটা বিষম যন্ত্রণা ভোগ করছে।

নাদের বললে, ঘুম হচ্ছে না ডাক্তারবাবু, চোখের পাতায় পাতায় করতে পারছি না। মাথার তালুটা যেন দপদপ করছে, বুকের ভিতর কি যেন হচ্ছে।

তার হাতটা তুলে ধ'রে ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষা ক'রে বললে, জ্বর তো কই হয় নাই !

জ্বর নয় আজ্ঞা।

তবে কি ?

আপনাকে গোপনে বুলব হুজুর।

তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। তারপর বললেন, বল কি হয়েছে তোমার ?

সমস্ত প্রকাশ ক'রে ব'লে নাদের বললে, হুজুর, দিনরাত মন আমার ঐ মন্তর আওড়াচ্ছে—দিনরাত। আমি যত ভাবছি, ভুলে থাকি, ও মন্তর আমি ভুলে থাকি, কিছুতেই ভুলতে পারছি না। মন কেবলই ঐ মন্তর বিড়-বিড় ক'রে পড়ছে। ঘুমাতে পারছি না, তিন রাত ধ'রে জেগে ব'সে আছি। এমন কি ওষুধ আছে বাবু, যাতে যা শিখেছি সব ভুলে যাই ?

ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

নাদের কাতরভাবে বললে, ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার তাড়াতাড়ি উঠে এক দাগ মরফিয়া মিকশ্চার তৈরি ক'রে তাকে খাইয়ে দিয়ে বললেন, তুমি শুয়ে ঘুমোও দেখি। এইবার দেখ ঘুম আসবে। আমি দরজা-জানলাগুলো বন্ধ ক'রে দিই।

কয়েক মিনিটের মধ্যে নাদের প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। সে ঘুম তার ভাঙল বিকেলবেলা—বেলা তখন তিনটা।

ডাক্তার বললেন, শরীরটা বেশ সুস্থ হয়েছে নাদের?

দুর্বলভাবে নাদের বললে, আজ্ঞা হাঁ বাবু।

মাথাটা হাল্কা হয়েছে? আর দপদপ করে না?

না। তবে শরীর যেন হালছে, গায়ে যেন জোর নাই আমার।

স্নান কর, কিছু খাও, খেলেই ওটা সেরে যাবে। মরফিয়াতে শরীর একটু দুর্বল হয়।

ডাক্তার নাদেরকে আবার একটা ওষুধ দিলেন, তারপর তাকে স্নান করিয়ে নিজে তার সামনে ব'সে তাকে জল খাওয়ালেন। শরবৎ-গ্লাসটা নিঃশেষে পান ক'রে নাদের বললে, আঃ, এতক্ষণে দেহে জীউ ফিরে এল।

ডাক্তার বললেন, খাবারগুলো খেয়ে ফেল, তা হ'লে দেখবে শরীর আরও সুস্থ হবে। আর কোন কিছু থাকবে না।

কয়েক কুচি শশা মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে নাদের হঠাৎ আবার স্তব্ধ হয়ে গেল।

ডাক্তার বললেন, ওগুলো খেয়ে ফেল তুমি।

নাদের ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আবার যদি তেমুনি হয় ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার বললেন, কেন তুমি ওসব মনে করছ? আর ওগুলো তোমার কিছু নয়। ভুল, মিথ্যে কথা।

নাদের বার বার ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করলে, না না বাবু, মিছা নয়, ওস্তাদ আমার ঝুট বলবার লোক ছিলেন না।

ডাক্তার বললেন, আচ্ছা, বেশ, কোন গাছের উপর পরখ কর তুমি।

নাদের বললে, উপায় নাই বাবু, মানুষের চেয়ে গাছের জান কত বড় বলেন দেখি, কত ফল দেয়, কত বেশি দিন বাঁচে বলেন তো! ওস্তাদ আমার বলতেন—

ডাক্তার অবাক হয়ে নাদেরের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, আচ্ছা, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমিই বল তো—সাপ যে ধর তোমরা, তাতে সাহস, হাতের কসরৎ বেশি দরকার, না, মন্তর দরকার?

নাদের ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইল, সে যেন কি বুঝবার চেষ্টা করছিল।

ডাক্তার আবার বললেন, দেখ, সেদিন যে সেই বেদের মেয়েটি তোমাকে মৌমাছি মারলে, সেগুলো তো ধুলোমন্ত্রের জোরে মৌমাছি হয় নি। আমার বাগানের কোণে একটা মৌচাক ছিল, সেখান থেকে সে ধ'রে এনেছিল। তুমি মৌমাছি মুঠো ক'রে ধরতে পার; মিথ্যে ব'লো না।

নাদের বললে, পারি বাবু। মৌমাছি কেনে, বোলতাও ধরতে পারি। একটা গাছের রস মন্তর প'ড়ে হাতে মেখে ধরলে আর বোলতা মৌমাছি কিছু করতে পারে না।

ডাক্তার বললেন, গাছের রসটা সত্যি, ঐ মন্তরটি মিথ্যা কথা। ওতে কিছু হয় না নাদের।

নাদের বিবর্ণমুখে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইল। ডাক্তার অনেক বুঝিয়ে তাকে বললেন, আর ওসবই বা কেন নাদের, তার চেয়ে ভগবানের নাম কর।

নাদের ধীরে ধীরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বের হয়ে গেল।

ডাক্তার ম্লান হাসি হেসে আপন মনেই বললেন, আচ্ছা পাগল !

চাকরটা চা-জলখাবার এনে নামিয়ে দিলে। বৈশাখের অপরাহ্ণে রোদ তখনও ঝাঁঝাঁ করছিল।

সন্ধ্যার মুখে ডাক্তার খোলা বাতাসের জন্য গ্রাম থেকে বেরিয়ে মাঠের দিকে চলেছিলেন।

এ কি, নাদের নয়? সত্যই নাদের, পথের ধারে একটা জায়গায় সে ব'সে ছিল। ডাক্তার প্রশ্ন করলেন, কি নাদের, তুমি এখনও এখানে ব'সে ?

নাদের তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অত্যন্ত দুর্বল কণ্ঠস্বরে বললে, গা হাত পা সব কাঁপছে বাবু, শরীরে যেন আর বল নাই, সব হারিয়ে গিয়েছে। কি ক'রে এতটা পথ যাব ?

ডাক্তার বললেন, দেখি, তোমার হাতটা দেখি! এমন তো হবার কথা নয় !

নাদের হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বললে, আপনি বুলছেন সব মিছা ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার বিরক্ত হলেন, এখনও তুমি ঐ কথা ভাবছ ?

নাদেরের ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল, সে চোখ মুছতে মুছতে বললে, আমার আর কি রইল বাবু ? সব যে হারিয়ে গেল !

পাটনী

উপকথায় বাস্তবতার বালাই নাই। অসম্ভব কিছুকে কল্পনা-বৈচিত্র্যে মনোহর ক'রে মানুষকে আকাশ থেকে ফুল পেড়ে দেবার আশ্বাস দিতে পারলেই হ'ল। আর কিছু চাই না। নইলে যে গঙ্গার স্রোতে যুগ যুগ ধ'রে কত মহানগরী ডুবে গেল, ভেসে গেল, পাহাড়ের পাথর কেটে যে আপনার পথ ক'রে চলেছে, প্রতি বৎসর যার স্রোতের বেগে এবং ক্ষুরধারে বিস্তীর্ণ তটভূমি ভেঙে পড়ছে মহাশব্দ ক'রে, সেই গঙ্গার নাকি গতি রুদ্ধ হয়েছিল ভাগাড়ের হাড়ের স্তূপে—এই কথা দিয়ে প্রবাদ বা উপকথার আরম্ভ হয়। অবশ্য হাড়ের স্তূপটার গুরুত্ব বাড়াবার জন্য বাস্তব সম্বন্ধে সচেতনবক্তারা বলে, সেই আদিকাল থেকে জ'মে আসছিল গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া, কুকুর-বেড়ালের হাড়, জ'মে বিন্ধ্য পাহাড়ের মত হয়েছিল তার কলেবর। অর্থাৎ স্থান ও কালের ব্যাপকতার বিস্তৃতির উপর সুকৌশলে এক বিপুল ওজনকে চাপিয়ে দেয়।

"মা গঙ্গা ব্রহ্মা-কমণ্ডলু থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গ থেকে মর্ত্যভূমে অবতরণ ক'রে সগরসন্তানদের উদ্ধার করবার জন্য চলেছিলেন; পথিমধ্যে বঙ্গদেশে এবম্প্রকার ঘটনাটি ঘটেছিল। ভগীরথ বিব্রত হয়ে ভাবছেন, এমন সময় বনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল হাজার হাজার মানুষ। তারা চণ্ডাল। তারা এসে দলে দলে লেগে গেল সেই হাড়ের স্তূপ সরিয়ে মায়ের জন্য পথ রচনার কাজে। এক ফালি পথ তৈরি হ'ল বহু পরিশ্রমে, তখন মা তার মধ্য দিয়ে বের হলেন বিপুল বেগে। হাড় মানুষ সব ভেসে চ'লে গেল মায়ের ঐরাবৎ-ভাসিয়ে-দেওয়া পাহাড়-প্রমাণ ঢেউয়ে। বাঁচল মাত্র একজন চণ্ডাল। সে জোড়হাত ক'রে ডেকে বললে, হে দেবতা, এই কি তুমি

দিয়ে গেলে তিনকালের-জমা-করা জানোয়ারের হাড় সরিয়ে তোমার পথ ক'রে দেওয়ার ফল ?

মা গঙ্গার এতক্ষণে সম্বিত ফিরল। তিনি লজ্জিত হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, বাছা, দুঃখ ক'রো না, তোমার আত্মীয়-জ্ঞাতিদের আমি চণ্ডাল জন্ম থেকে মুক্তি দিয়ে স্বর্গলোকে অক্ষয়বাসের সৌভাগ্য দিয়েছি।

চণ্ডালটি তখন কাঁদতে কাঁদতে বললে, তবে মা, আমি কি অপরাধ করেছি যে, ওই ভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত হলাম!

মা বললেন, অপরাধ নয় বাছা, তোমার পুণ্য ওদের সকলের চেয়ে বেশি, তাই তুমি থাকলে।

চণ্ডাল বললে, রহস্য করছ মা ?

মা হাসলেন, বললেন, না। তুমিই প্রথম হাড় মাড়িয়েছ। তাই তুমি থাকলে আর তোমার বংশ থাকল—এই ঘাটে শ্মশানদণ্ড হাতে পাপী তাপী জীবজন্তুকে নরক থেকে পরিত্রাণ ক'রে শিবলোকে পার করবার পাটনী হয়ে। আমার জলের মাহাত্ম্য অক্ষয়, কিন্তু এই আমার গর্ভে এই ঘাটে তোমার বংশাবলীর হাতে যার চিতা জ্বলবে, তার স্থান হবে শিবলোকে। যে লোকের রাজার জটায় আমার বাস, যে লোকে বিরাজ করেন জগন্মাতারূপে আদ্যাশক্তি, যে লোকে বৃষভে এবং সিংহে, ময়ূরে মূষিকে এবং সর্পে একসঙ্গে বাস ক'রে বিচরণ করে সমান মর্যাদায়, সমান স্নেহে, সেই পরম মঙ্গলময় ঐশ্বর্যহীন চৈতন্যময় শিবলোকে।"

প্রমাণ হিসাবে গঙ্গা আছেন, চণ্ডালেরা আছে, দিনে রাত্রে দেশ-দেশান্তর থেকে লোকের কাঁধে চেপে শিবলোকের যাত্রী অর্থাৎ শবও আসে। কোনদিন দশ, কোনদিন বিশ, কোনদিন পঁচিশ, কোন-কোনদিন ত্রিশও আসে। তারা পাটনীর কড়ি দিয়ে শিবলোকের টিকিট কাটে। পৌঁছানো-সংবাদ দেবারও উপায় নাই, কারণ ফিরেও আসে না কেউ। সুতরাং

প্রবাদ বা উপকথাটি—তালগাছের বুকে জন্মানো বটগাছের মত মানুষকে জড়িয়ে রেখেছে পাকে-পাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে।

শ্মশানের এক ধারে আছে এক প্রাচীন বট। তার তলদেশটি বাঁধানো, বেদীতে পোঁতা আছে সিঁদুর-মাখানো ত্রিশূল, শ্মশানের পোড়া কাঠের এক ধুনি জ্বলছে অহরহ, ত্রিশূল এবং ধুনিকে সামনে রেখে ব'সে থাকেন এক সন্ন্যাসী। এখানেও আছে অনুরূপ প্রবাদ। ধুনিটা নাকি জ্বলছে এই শ্মশানঘাটে প্রথম চিতা প্রজ্বলনের সঙ্গে, কখনও নেবে নাই; সন্ন্যাসীর বয়স সম্বন্ধে প্রবাদটা এত অবাস্তব নয়, তবু এই স্থানটার অর্থাৎ পটভূমির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্য লোকে বলে—আমরা আজীবনই দেখছি বাবাকে, আর ওই রকমই দেখছি।

শ্মশান থেকে একটু ওপরে, সমতল ভূমির উপর আছে একখানি বাড়ি। শ্মশান ও পাটনীপল্লী এবং বাজার ও বসতির ঠিক মধ্যস্থলটিতে তার অবস্থিতি। পূর্বে বলত—চটি, মধ্যে নাম ছিল—সরাইখানা; এখন লোকে বলে—হোটেল।

খান ছয়েক ছোট বড় ঘর এবং তিনটে মেটে ও খ'ড়ো বারান্দায় ফার্স্ট, সেকেণ্ড, থার্ড ক্লাস—তিন রকম ব্যবস্থা। ছোট ঘর পাকা, মেঝেয় তক্তাপোশ পাতা; বড় ঘর মেটে, মেঝেতে পাতাই আছে খান দশেক মাদুর, প্রয়োজন হ'লে আরও খান দু-তিন মাদুর এনে যোগ দিয়ে তেরোখানা মাদুরে পনেরো জনের ব্যবস্থা হয়; তিনটে বারান্দায় খেজুরচাটাই তালপাতার চাটাই বিছিয়ে গাদাগাদি ক'রে প'ড়ে থাকে তিরিশ-পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ; বর্ষা ও শীতের সময় বারান্দায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় চট-সেলাই-করা পর্দা। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা স্বপাকে। কাঠ হাঁড়ি নুন তেল চাল ডাল থেকে চিঁড়ে মুড়ি গুড় যা চাও—এই হোটেল বা সরাইখানা বা চটি, যাই বল, না কেন—এইখানেই পাওয়া যায়। থাকবার জন্য কেলাস অনুসারে ভাড়া দিয়ে থাক, রুচি অনুসারে যা ইচ্ছে দাম দিয়ে কিনে নাও, রান্না কর, খাও।

থাওয়াও—আপত্তি নাই। প্রিয়জন হারিয়ে কেউ যদি অনাহারে থেকেই দুঃখের মধ্যে সুখ পায়, তাই পাক। যদি পয়সা না থাকে, তার জন্যই যদি কেউ অনাহারে থাকে, তাও কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। হোটেল-ওয়ালা বলে, পিতৃপুরুষে ব'লে গিয়েছেন—রাজা ফকির হয়ে আসেন, তাঁকে দয়া করতে গিয়ে তাঁর অপমান ক'রো না। যদি রাজ্য অসার ব'লে বুঝে ফকিরি নিয়ে থাকেন, তখন তবে তিনি হরি ব'লে তোমার সামনে নিশ্চয় দাঁড়াবেন, তখন যেমন সাধ্যি দিয়ো, বাটিতে না, পাত্রে না, আঁজলা ভ'রে দিয়ো—যে আঁজলায় ফুল ভ'রে দেবতার চরণে পূজা দাও।"

* * *

হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম এইখানে। এই স্থানটির সঙ্গে একান্তভাবে সামঞ্জস্যহীনভাবে বললে ঠিক বলা হবে না, একেবারে বিরোধী ভাবের ব্যাপার নিয়ে গিয়ে পড়েছিলাম। একটা স্ট্রাইকের ব্যাপার নিয়ে,—নিয়ে ঠিক নয়, দেখতে গিয়েছিলাম।

গঙ্গাতীরের বনজঙ্গলে-ঘেরা শ্মশানভূমিটির উত্তর গায়েই চণ্ডালপল্লী। চণ্ডালপল্লীর উত্তরে একটি ছোট বাজারের কথা পূর্বেই বলেছি। বাজারটির খানিকটা উত্তরে বছরকয়েক হ'ল গোটা দুয়েক রাইস্ মিল গ'ড়ে উঠেছে। প্রাচীন কাল হতে রাঢ় থেকে গঙ্গাপার হয়ে বরেন্দ্রভূমে যাওয়ার একটা পথ আছে। এই পথ ধ'রে রাঢ়ের ধান এসে জমা হ'ত এ পারে। ও-পারে এসে জমা হ'ত রবিশস্য। বিনিময় চলত। ইদানীং কলকারখানার যুগে একজন মাড়োয়ারী ব্যবসাদার এসে এখানে চালের কল তৈরি ক'রে বসলেন। তার পর আর একজন। ও-পারে গ'ড়ে উঠেছে একটা চিনির কল। সম্প্রতি ওই প্রাচীন শড়কটির ঘাটে একটি স্টীমার-ঘাট তৈরি করার চেষ্টাও চলছে।

যুদ্ধ থেমে যেতেই দেশে যে স্ট্রাইকের একটা ঢেউ এসে গেল, সে ঢেউ

গিয়ে লাগল ওই শ্মশানভূমির পাশের কলকারখানার ছোট বন্দরটিতেও। স্ট্রাইক পরিচালনার জন্য যাঁরা এসেছেন, তাঁদের কাছে স্থানটির বিবরণ শুনে কৌতূহলী হয়ে নিছক দর্শকের মতই এসে পড়লাম।

মজুরদের মধ্যে ওই পাটনীরাই প্রধান। আদিকালে মা-গঙ্গা যে পাটনীটিকে বাঁচিয়েছিলেন, তার বংশাবলীতে এখন বেশ একটি গ্রাম গ'ড়ে উঠেছে। ঘর পঞ্চাশেক পাটনী-পরিবারে পুরুষের সংখ্যা এক শোর বেশি, মেয়েদের সংখ্যা আরও বেশি, অল্পবয়সী অর্থাৎ দশ থেকে চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়ের সংখ্যাও কম নয়; এরাও খাটতে যায় কলে। পাটনীরা ছাড়া আরও মজুর আছে, কিছু সাঁওতাল, কিছু রাঢ়ের বাউরী হাড়ী।

বাসা নিয়েছিলাম ওই চটি বা সরাইখানা বা হোটেলে। বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম পাটনীদের কথা। পাটনীরা মজুর খাটে!

পাটনীদের মাতব্বর কপিল রূঢ়স্বরে বললে, তা নইলে খাব কি? দেবে তুমি খেতে? চিরকালই তো খেটে আসছি।

উত্তর দিতে পারলাম না। সত্যই তো, নইলে খাবে কি? কিন্তু—। হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা। বললাম, কেন, শ্মশানঘাটে তো পাটনীর কড়ি এক কাহন—মানে, এক টাকা, অনেকে তো বেশিও দেয়। শবও তো কম আসে না!

কপিল বললে, তা আসে, আর বেশিও অনেকে দেয় সে কথা মিথ্যা বল নি। তবে ঘাটের কড়ি তো ষোল আনা আর আমরা পাই না। ভাগাড়ের ভাগীদার যে অনেক। শেয়াল, শকুনি, হাঙর, কুমীর।

মানে?

জমিদারের জমি, তার দরুন আধা বখরা তাঁর। তার আবার গোমস্তা আছে, হিসেব রাখে, কোথাকার পারের যাত্রী কি বৃত্তান্ত, তার দরুন দু আনা সে বেটার। বাকি ছ আনা থাকে, তার আদ্ধেক পাবে

শ্মশানের দণ্ডধারী, আর আদ্ধেক পাবে যার যেদিন পালা সে। বাকি লোকের হবে কি? খাবে কি? তোমরা বাবু-লোকেরা এমনই বটে। পাটনীরা মজুর খাটে!—ব্যঙ্গভরে বললে শেষ কথাটা।

মার্কস্‌বাদী কর্মী বন্ধুদের একজন রিপোর্ট লিখছিলেন খবরের কাগজে পাঠাবার জন্য। তিনি মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, শিবলোক সার্ভিসের পেছনেও ক্যাপিটালিস্ট আছে। রূপোই বলুন আর তামাই বলুন, ওই ধাতুর তারেই আঁতুড়ঘর থেকে শ্মশান, ইহলোকের ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড থেকে পরলোকের ফ্লাইং স্টেশন পর্যন্ত শক্ত ক'রে বাঁধা, এবং সর্বত্রই এই এক কথা। এক্সপ্লয়টেশন।

হঠাৎ বাইরে একটা গোলমাল উঠল ব'লে মনে হ'ল। দশ-বারো জনের সমবেত কণ্ঠস্বরে হরিধ্বনি—'বল হরি—হরিবোল' এখানে যখন-তখন শোনা যায়। দু-তিন জন শ্মশানযাত্রী একসঙ্গেও আসে অনেক সময়। তখন ত্রিরিশ পঁয়ত্রিশ জন সমস্বরে ধ্বনি দেয়। কিন্তু এ ধ্বনি সে ধ্বনি নয়। কপিলই বললে সে কথা। কানের পাশে হাত দিয়ে মন দিয়ে শুনে সে উঠে পড়ল। বললে, আমি যাই। আমাদের দলই বটে। ব'লে এলাম, একটুকুন সবুর কর্, তা ওদের সইছে না।

ত্রস্ত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে কপিলের মাথাটা ঠুকে গেল দরজার উপরের বাজুতে। মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়ল সে। লেগেছে যথেষ্ট।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে জিজ্ঞাসা করলাম, কেটে যায় নি তো?

মাথা থেকে হাতখানা সরিয়ে হাতের তালুটা দেখে বললে, না।

কপালটা ফুলতে শুরু করেছে দেখলাম। বললাম, লেগেছে তো খুব!

কপিল হেসে বললে, পিতিপুরুষে ব'লে গিয়েছে—মাথা নামিয়ে চলিস বাবারা, সোজা-মাথার বিপদ অনেক। তা আর আমার হ'ল না। আর ভগবানও কি তালগাছ ক'রে গড়েছিল আমাকে!

বলতে বলতেই সে উঠে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে কর্মী বন্ধুটিও উঠে গেলেন।

আমি ব'সে কপিলকেই দেখছিলাম। কে বলবে, ষাট বছরের উপর বয়স হয়েছে লোকটার? ঝাড়া ছ ফুট লম্বা, খাড়া সোজা মানুষ; মাথার চুলে অল্পস্বল্প পাক ধরেছে, কিন্তু দেহের রুক্ষ চামড়া সবল পেশীর সঙ্গে টান হয়ে জড়িয়ে আছে; উখো দিয়ে ঘষা কর্কশ গঠনের লোহার অস্ত্রের মত দেখতে লোকটা। শুনেছি প্রকৃতিও নাকি এমনি হিংস্র। বাক্যের পরিচয় আগেই পেয়েছি। আরও আছে, ওই কপিলই নাকি মিল-মালিকের গোপন দালাল। এর আগে ও প্রকাশ্যভাবেই মজুরদের সঙ্গে দাঙ্গা করেছে মালিকের পক্ষ নিয়ে। এবার ওকে মজুরদের নেতা ক'রে স্বপক্ষে টেনেছে কর্মীরা। কিন্তু সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে কপিলের উপর।

দীর্ঘপদক্ষেপে কপিল চ'লে গেল। ওর পায়ের হাড়গুলোয় মট মট ক'রে শব্দ উঠছিল,—যখন ও দ্রুত হাঁটে, তখন পায়ের হাড়ের গাঁঠে এমনি শব্দ হয়।

আমি শুয়ে পড়লাম আবার অলসভাবে।

দূরে মজুরদের আওয়াজ উঠছে। কোন শ্মশানবন্ধুর দল সদ্য শ্মশান থেকে ফিরে এসে হরিধ্বনি দিয়ে হোটেলে ঢুকল। পাটনীপল্লীতে ন্যাংটা ধুলো-মাথা ছেলের দল কলরব করছে। কতকগুলো কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রে চেঁচিয়ে ছুটে যাচ্ছে জঙ্গলের দিকে। সম্ভবত কোন শিয়াল শবের দগ্ধাবশেষের ভাগীদার হতে এসেছিল। কোন গাছের মাথায় শকুন ডাকছে।

আমার দৃষ্টি পড়ল হোটেলের ঘরখানার দেওয়ালের দিকে। সমস্ত দেওয়ালটা লেখায় ভ'রে আছে। কত নাম, কত ঠিকানা, কত বাণী, কত প্রার্থনা, কত গানের কলি! গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম থেকে বন্দেমাতরম্ পর্যন্ত, দরকথার গঙ্গাস্তব থেকে ডি. এল. রায়ের পতিতোদ্ধারিণী পর্যন্ত; 'সংসার

অসার', 'মায়াময়মিদং অখিলং' থেকে রামপ্রসাদের 'শ্মশান ভাল ভাসিস ব'লে শ্মশান করেছি হৃদি, 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র—"এই শ্মশানে সেই মুখখানি" থেকে রবীন্দ্রনাথের "মৃত্যু মাঝে চিতা ভস্ম হ'তে সবার সমান" পর্যন্ত। নামে স্যাংটেশ্বর থেকে নীহারেন্দু পর্যন্ত, খেতাবে দেবশর্মা থেকে বাসু পর্যন্ত। হরফে বাংলা দেবনাগরী ইংরেজী পর্যন্ত। দেবনাগরীর একটা লেখা আকর্ষণ করল আমাকে। উঠে এসে পড়লাম। বিচিত্র মনে হ'ল।

"আশক্ কি পাতা কাঁহা?" অর্থাৎ প্রণয়ী বা প্রেমিকের ঠাঁই কোথায়?

"সাম কঁহি, সুবা কঁহি, দিন কঁহি, রাত কঁহি, কাটে জিন্দেগী পথপর, মরে যা-কর্ দরিয়া কিনারমে।" অর্থাৎ—প্রেমিকের ঠিকানা সকালে কোথাও, সন্ধ্যায় কোথাও, দিনে কোথাও, রাত্রে কোথাও, জীবনটা কাটে পথে পথে, মরবার সময় গিয়ে পড়ে নদীর ধারে। সম্ভবত গঙ্গাতীরই কাম্য ছিল এই দেওয়ানা প্রেমিকের।

* * *

মিল এরিয়ার গণ্ডগোলে পাক ধ'রে উঠল। দূরাগত গন্ধ থেকে পাকা ফলের অস্তিত্ব অনুমান করার মতই ওখানকার জনগণের সমস্বরে ধ্বনি দেওয়ার শব্দ শুনে ব্যাপারটা অনুমান করলাম আমি। কর্মী বন্ধুরা ফিরে এলেন উজ্জ্বল মুখ নিয়ে। এখন চাই মজুরদের খোরাক। কলকাতায় অর্থ সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে টাকার জন্যে একজন চ'লে গেলেন সন্ধ্যার ট্রেনে। সঙ্গে গেল কপিল। কপিলের পোশাক দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম আর একবার। সে একটা নীল রঙের মোটা জিনের ফুল পেন্টালুন পরেছে; গায়ে দিয়েছে সস্তা ছিটের জামা, ফেরিওলার কাছে কেনা ব'লেই মনে হ'ল।

পাটনীদের কারুর গায়ে কাশ্মীরী শাল দেখলেও আমি আশ্চর্য হব না। পাটনীপল্লীতে গেলেই দেখতে পাবে—মাটির উঠানে নানা রকমের মাদুর বিছিয়ে তার উপর ব'সে আছে পাটনীদের নোংরা ছেলেমেয়ের দল। হরেক রকম দামী ছিটের বালিশও দেখতে পাবে, চারদিকে ছড়ানো দেখবে তুলো, ছেঁড়া তোষকের টুকরো দেখবে গাদা হয়ে আছে এক দিকে, এক দিকে দেখবে গাদা হয়ে আছে পোড়া কাঠ। উঠানে দড়ির আলনায় দেখতে পাবে শুকুচ্ছে ময়লা সাধারণ কাপড়ের সঙ্গে পুরোনো রেশমী আলোয়ান, মলিদা কাশ্মীরী শাড়ির ছেঁড়া টুকরোও দেখতে পাবে দু-একটা। ভাঙা খাটের পায়া-বাজুও দেখতে পাবে। শিবলোকের যাত্রী যারা আসে, তাদের লাগেজ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া নিষেধ। এমন কি এখানে বেশভূষা পর্যন্ত পাল্টাতে হয়। গঙ্গার জলে স্নানান্তে ঘৃতসিক্ত হয়ে একমাত্র নববস্ত্র পরিধান ক'রে, চন্দন ধুয়ে মাটির তিলক কেটে নবসজ্জা করতে হয়। সোনা রূপো থাকলে তাও এখানকার ভারপ্রাপ্ত এবং বরপ্রাপ্ত দণ্ডধারী খুলে বাজেয়াপ্ত ক'রে নেবে। সোনা রূপো নিয়ে কেউ বড় আসে না, তবে বাঁশের মাচা থেকে ছপ্পর খাটে শুয়ে, সামান্য চাদর থেকে কাশ্মীরী শাল পর্যন্ত হরেক রকম সাজে সেজে যাত্রীরা আসে। এ সবের ষোল আনাই পাটনীদের প্রাপ্য। এতে জমিদার গোমস্তা কারুর ভাগ নাই। এর অর্ধেক পায় দণ্ডধারী, অর্ধেক পায় শ্মশানের যায় যেদিন পালা সে। কাজেই কাশ্মীরী শাল গায়ে, বেনারসী ধুতি কি শাড়ি প'রে যদি কপিল আসত তবে বিস্মিত হতাম না। কিন্তু নীল পেন্টালুন দেখে বিস্ময়ের অবধি রইল না আমার। এ পোশাক প'রে এখানে তো কেউ আসে না! শিবলোকের ফ্লাইং সার্ভিসের মধ্যে ইয়োরোপীয়ান কম্পার্টমেণ্টের নজিও নাই এবং নতুন ক'রে খুলেছে এও অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব—পশ্চিমে সূর্যোদয়ের মতই অসম্ভব।

কপিল একে কপিল—তার উপর স্টাইকের উত্তেজনায় বদমেজাজী

মহিষের মত হয়ে রয়েছে, তবু কৌতূহল সম্বরণ করতে পারলাম না। কৌশল ক'রেই ঘুরিয়ে প্রশ্নটা করলাম, বললাম, বাঃ, এ যে একেবারে লেবার-লীডারের মত সাজ হয়েছে কপিল! চমৎকার মানিয়েছে। এটা কোত্থেকে জোগাড় করলে কপিল?

কপিল আমার মুখের দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল, তারপর বললে, তোমার দেখি সকল তাতেই খোঁজ! এটা কোথা থেকে জোগাড় করলে! রাজারা মানিক পায় কোথা?

হেসে বললাম, রাজারা মানিক এক জায়গা থেকে পায় না কপিল, নানা জায়গা থেকে পায়। সময় নেই, নইলে কোহিনুর মানিকের গল্প তোমাকে শুনিয়ে দিতাম।

কথাটার প্যাঁচের মধ্যে প'ড়ে এবং কথা বলার মিষ্ট ভঙ্গিতে অপেক্ষাকৃত তুষ্ট হয়ে কপিল বললে, দু বছর ইষ্টিমারে খালাসীগিরি করেছিলাম। পোশাক দিয়েছিল। কামিজটা ছিঁড়ে গিয়েছে। এটা আছে।

ওরা চ'লে গেল। আমি আবার আশ্রয় নিলাম ঘরের মধ্যে। দেওয়ালে লেখাই আমার সময় কাটাবার অপরূপ রহস্যোপন্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা ইংরেজী লেখা চোখে পড়ল—'Men may come, men may go, I go on for ever."—সম্ভবত গঙ্গাতীরে এসে কোন ইংরেজীনবিসের ভাবোদ্রেক হয়েছিল। ওরই ঠিক নীচেই লেখা 'কালস্য কুটিলাগতি'। কালপ্রভাবে কোন অসম্ভব হয়তো সম্ভব হয়েছিল—অন্তত লেখকের কাছে তাই মনে হয়েছিল। পাটনী কপিলের খালাসীগিরি করা দেখে লিখেছিল কি? চকিতে কথাটা মনে হ'ল আমার।

হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে সমারোহ ক'রে কোন শ্মশানযাত্রীর দল হরিধ্বনি দিয়ে উঠল। একসঙ্গে অন্তত বিশ-পঁচিশজনে 'বল হরি হরিবোল' দিয়ে চলেছে—যেন সে একটা হৈ-হৈ ব্যাপার। ধ্বনির মধ্যে হরিনাম সত্য হ'লেও ভঙ্গিতে রয়েছে যেন 'তফাত যাও—তফাত যাও' হাঁক। দেখতে দেখতে

ওই ধ্বনির সঙ্গে কলরব জুটে গেল প্রচুর ; চীৎকার, উল্লাস, হাসি, তার সঙ্গে ক্রুদ্ধ বাদানুবাদ, কান্না অনেক কিছু।

বেরিয়ে এসে দেখলাম, ছপ্পর খাটে শালের আচ্ছাদন দিয়ে সমারোহ ক'রে শিবলোকের কোন যাত্রী চলেছে। বার্দ্ধক্যজীর্ণ, চন্দনচর্চিত, অনাবৃত। গলায় ফুলের মালা, আশেপাশে ফুল ছড়ানো। সঙ্গে লোকজন অনেক। সাজ-সরঞ্জামও প্রচুর। দশ-বারোটা সুটকেসই চলেছে হাতে হাতে। ভৃত্য-শ্রেণীর লোকের মাথায় খাবার-দাবার চলেছে। প্রচুর পরিমাণে তেলেভাজা মুড়ি দেখে এদিক ওদিক ভাল ক'রে সন্ধান করতেই নজরে পড়ল, দু-তিন জনের হাতে গামছায় বাঁধা ভারী পুঁটলির মধ্যে লম্বা আকারের গোলাপো অর্থাৎ বোতল-জাতীয় জিনিসও চলেছে। কোলাহলের মধ্যে শোনা গেল না, কিন্তু ঠুং ঠাং শব্দ উঠছে নিশ্চয়। হাসছে, কাঁদছে, মারামারি ক'রে কলহ করছে পাটনীদের ছেলেমেয়েরা। একজন একটা থলি থেকে মুঠো মুঠো পয়সা ছিটিয়ে চলেছে। এক মুঠো পয়সার উপর পাল দরুনে পাটনীর ছেলেমেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ধুলো উড়িয়ে কাড়াকাড়ি ক'রে আবার ছুটছে পিছনে পিছনে। আমিও পিছন নিলাম।

*　　*　　*

যাত্রীটি একজন পুরুষসিংহ ছিলেন ইহলোকে। পরিচয় পেলাম যাঁরা তাঁকে শিবলোক সার্ভিসের ফ্লাইং স্টেশনে বিদায় দিতে এসেছেন তাঁদের কাছেই। একেবারে খাঁটি সিংহের মতই বিক্রমে ও চাতুর্যের সহিত লক্ষ্মীকে শিকার ধরার মত ধ'রে আয়ত্ত করেছেন। ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে কোন খান থেকে শুধু-মুখে ফেরেন নি। বহু বিচক্ষণ শিকারী নানা ধরণের ফাঁদ পেতেছেন, রাত্রির পর রাত্রি মারণাস্ত্র নিয়ে বিনিদ্র চোখে যাপন করেছেন, কিন্তু পুরুষসিংহটি অসাধারণ বিচক্ষণতা বা চাতুর্যের সঙ্গে সকল জনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিয়েছেন।

সিংহশাবক দেখলাম তিনটি। প্রিয়দর্শন শিক্ষিত ছেলে। শববাহকেরা বয়স অনুসারে জটলা ক'রে মুড়ি ও তেলেভাজা সহযোগে হৃদয়-শ্মশানে পাতা পাকস্থলী-ঘট কারণ-বারিতে পূর্ণ করতে ব্যস্ত হ'লেও তারা তিন জনে বাপের স্মৃতিরক্ষার পরিকল্পনা করছিল মৃদু স্বরে। মধ্যে মধ্যে তদারক করছিল চিতা সাজানোর। চন্দনকাঠ সংগৃহীত হয়েছে, ঘিও দেখলাম এক টিন এসেছে। ছেলেরা আক্ষেপ করছে, 'ঘিটা বিশুদ্ধ গব্য নয়, দোকান থেকে টিনের ঘি ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া গেল না।' চিতা সাজাচ্ছে দুজন পাটনী। অদূরে ব'সে রয়েছে এক বৃদ্ধ। সাদা চুল, সাদা ভুরু, সাদা গোঁফ-দাড়ি,কালো রঙের মানুষটি বার্ধক্যজীর্ণ স্তিমিত-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে। মধ্যে মধ্যে শীর্ণ কণ্ঠে দু-চারটে প্রশ্ন করছে কর্মরত পাটনী দুজনকে।

ওই বৃদ্ধই দণ্ডধারী।

পাটনী-সমাজের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠই হয় দণ্ডধারী। পূর্ববর্তী দণ্ডধারীর দেহান্তের দিনে ঘর ছেড়ে ওই শ্মশানের ঘাটে স্নান ক'রে, গলায় মালা প'রে, কপালে গঙ্গামাটির ফোঁটা নিয়ে, শ্মশানের দগ্ধাবশিষ্ট কাঠে চিতা সাজিয়ে মৃত দণ্ডধারীকে দাহ ক'রে, সেই চিতার একটা পোড়া বাঁশ হাতে নিয়ে সে হয়েছে নূতন দণ্ডধারী। জমিদার একটা সান-বাঁধানো মেঝে টিনের চালা তৈরি ক'রে দিয়েছেন, সেই চালার মধ্যে সে শ্মশানের বাঁশ কাঠ ও তালপাতার চাটাই দিয়ে তৈরি ক'রে নিয়েছে একখানি ছোট ঘর, সেই ঘরে নূতন সংসার পেতেছে সেই দিন থেকে। বাড়ি ...কে খাবার আসে খায়, টিনের চালায় বা বটগাছতলায় সন্ন্যাসীর কা..হ ব'সে থাকে গঙ্গার জলস্রোতের দিকে চেয়ে, পিছনে শ্মশানভূমির প্রবেশমুখে হরিধ্বনি উঠলে উঠে দাঁড়ায়, এগিয়ে যায়; শববাহকেরা শব নামায়,—বালক বৃদ্ধ যুবা সধবা বিধবা তরুণী সুন্দর কুৎসিত। দণ্ডধারী বলে, খুলে দাও সব। শববাহকেরা অনাবৃতদেহ শবকে মাটিতে নামিয়ে দেয়। দণ্ডধারী সংগ্রহ ক'রে কাপড়চোপড়, শাল বেনারসী, গদি বিছানা, মাদুর চাটাই,

বাঁশ খাটিয়া খাট। কড়ি নেয় ছ আনা। চিতা সাজানোর প্রথম কাঠখানি পেতে দেয়, তারপর শববাহকেরাই চিতা সাজায়, সে উপদেশ দেয়। মুখাগ্নি করে শ্রাদ্ধাধিকারী। তারপর দণ্ডধারী দেয় চিতায় আগুন। বলে, সকল পাপের তোমার মোচন হ'ল—আমার আগুনে আর মা-গঙ্গার জলের পুণ্যে। শিবলোকে হোক তোমার বাস। চিতা নেবার পর সে খুঁজে বার করে আধপোড়া হাড় আর টুকরো টুকুরো অর্ধদগ্ধ স্নায়ুপিণ্ড। সেগুলি নিয়ে গঙ্গার জলে ছুঁড়ে দেয়, বলে, হাঙরে খা, কুম্ভিরে খা। কিছুটা ছিটিয়ে দেয় জঙ্গলের ধারে ধারে, বলে, শেয়ালে খা, কুকুরে খা, শকুনি খা, গৃধিনী খা।

দণ্ডধারী বৃদ্ধ বার্ধক্যের ভারে বেঁকে গিয়েছে। কণ্ঠস্বর দুর্বল হয়েছে। সে আকাশের দিকে মুখ তুলে হাত বাড়িয়ে বললে, তোর সব পাপ থাকল এই শ্মশানের মাটিতে চিতার ছাইয়ের তলায়, মা-গঙ্গা ভাসবেন, কূল ভাসিয়ে ময়লা মাটির সঙ্গে নিয়ে যাবেন ধুয়ে মুছে। তোর পুণ্য নিয়ে চ'লে যা বাবার দরবারে—চ'লে যা, চ'লে যা, চ'লে যা।

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর বোধ করি চিরকালই তীক্ষ্ণ ছিল, ধাতুর আওয়াজের মত। এই বার্ধক্যের দুর্বলতার জন্য সে কণ্ঠস্বর যেন একটা রহস্যের ছোঁয়াচ পেয়েছে ব'লে মনে হয়। চোখ বন্ধ ক'রে শুনলে মনে হয়, কোন দূর থেকে কে তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠস্বরে কথাগুলি বলছে, দূরে দাঁড়িয়ে আমি যেমন শুনছি তেমনই শুনছে পৃথিবীর অন্য সকলে, উপরে আকাশলোকে আকাশচারীও শুনছে।

চোখ বন্ধ ক'রেই ব'সে শুনছিলাম। মনে হচ্ছিল, কোন অতীত কালে গিয়ে পড়েছি।

হঠাৎ সেই রহস্যময় ক্ষীণ কণ্ঠের অন্য কথা শুনেই চমকে উঠলাম—না না, পাঁচ টাকা আমি লিব না। উঁহু। উ আমি লিব না। এক শো টাকা দিতে হবে। তার কম আমি লিব না।

চোখ খুলে দেখলাম, দণ্ডধারীর পাকা চুলে ভরা মাথাটা সবেগে আন্দোলিত হচ্ছে। না, না, উঁহু।

সদ্য-শিবলোকযাত্রীটির উদ্দেশ্যে গেট-পাসের যে হুকুমনামা উচ্চারণ করেছে সে, তার জন্য এক শো টাকা ফী দাবি করেছে। শিবলোকযাত্রীর পুত্রের হাতে দেখলাম, একখানা পাঁচ টাকার নোটের আধখানা বেরিয়ে রয়েছে।

মুহূর্তপূর্বের কল্পনার এবং অনুভূতির রঙিন বেলুন পিনের খোঁচায় চুপসে গেল এক মুহূর্তে। ভাল লাগল না আর, উঠে এলাম।

গঙ্গার বালুময় গর্ভ থেকে উপরে এসে পৌঁছে আবার থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। বৃদ্ধের শীর্ণ কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠল, কদর্য ভাষায় সে গাল দিচ্ছিল।

ফিরে দেখলাম, শিবলোকযাত্রীর পুত্রের সঙ্গে নয়, শ্মশানের পালিদারের সঙ্গে তার ঝগড়া বেধেছে। খাট-বিছানা-শালের ভাগ নিয়ে ঝগড়া। শ্মশানের পালিদার বলছে, তুমি তো রোজই পাচ্ছ, কত রাজা মহারাজা আসছে। আমার পালি তো বছরে তিন দিন। শালখানা আমাকে দাও।

বৃদ্ধ চীৎকার করছে, সে আমি দিব না। কখনও না। না—না—না।

পালিদার পাটনী এই জন্ম বলছে, ম'রে তুই যখ্ হবি বুড়া। এই জঙ্গলের কিনারায় কেঁদে কেঁদে বেড়াবি।

বৃদ্ধ কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দিচ্ছিল, অনেকগুলি কথা ...সঙ্গেই ব'সে উত্তেজনার অবসাদে সে মাটিতে হাত পেতে হাঁপাতে লাগল।

পালিদার বললে, তবে আমি কেটে ভাগ ক'রে নিব।

উপর থেকে নামছিল একটি ব্যক্তি। সে হেসে বললে, ঝগড়া করিস না। থাম্। আমি এসেছি। লোকটি এই সব মালের খরিদ্দার। শাল আলোয়ান চাদর ভাল অবস্থায় থাকলে কিনে নেয়, আর কেনে বিছানার

তুলো। খাট কেনবার জন্য আলাদা লোক আসে। খাট আসে কালে কস্মিনে। কাজেই সেও আসে কখনও কখনও।

ওদের কোলাহল থেমে গেল। আমি এসে সরাইখানায় আশ্রয় নিলাম। দেওয়ালের দিকে চেয়ে নতুন লেখা খুঁজতে লাগলাম।

*   *   *   *

দিন দশ-বারোর মধ্যেই অত্যন্ত আকস্মিকভাবে মিল-স্ট্রাইকটা একটা আশ্চর্য পরিণতিতে পৌঁছে গেল। সব চেয়ে বড় মিলের মালিক অকস্মাৎ হার্টফেল ক'রে মারা গেলেন। অবশ্য সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে কার্যকারণ নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যায়। দেহভার ছিল বিপুল, রক্তের চাপ ছিল অত্যধিক, তার সঙ্গে ধনসম্পদের প্রাচুর্যের সম্বন্ধ অবশ্যই পাওয়া যায়, এবং ধনীসুলভ মনে এই ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়ায় ক্রোধসঞ্চারের কারণকেও খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সে থাক্। মিল-মালিকের উত্তরাধিকারী পিতৃবিয়োগের বেদনায় ভাবাবেগের আতিশয্যেই হোক আর গদি আরোহণের শুভ মুহূর্ত সমাগমে চিরাচরিত উদারতা প্রদর্শনের রীতি অনুযায়ীই হোক, শ্রমিকদের দাবিদাওয়া অধিকাংশই মেনে নিয়ে মিটিয়ে নিলেন ব্যাপারটা। ধর্মঘট যাঁরা পরিচালনা করছিলেন তাঁরাও আপত্তি করলেন না। কপিলকে নিয়ে তাঁরা বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন।

ইতিমধ্যেই কপিল মিল-মালিকের তরফ থেকে ঘুষ খেয়েছে। অন্য দিকে শ্রমিকদের জন্য সংগৃহীত খোরাকির তহবিল থেকেও টাকা আত্মসাৎ করেছে। কর্মী যাঁরা এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। ধর্মঘট মিটমাটের প্রস্তাবের মধ্যে কপিলই কিন্তু সর্বাপেক্ষা লাভবান হ'ল। তার মাইনে বেড়ে গেল আট টাকা। কপিল প্রচুর মদ্যপান ক'রে প্রায় তাণ্ডব জুড়ে দিলে। বিকেলে মীটিং করলেন কর্মী বন্ধুরা। বেপরোয়া বক্তৃতা দিলে কপিল নেশার ঝোঁকে। অর্থাৎ যা খুশি তাই ব'লে গেল। বহু কষ্টেই তাকে শান্ত নয়, ক্ষান্ত করতে হ'ল।

রাত্রে শুয়েছিলাম বিনিদ্র চোখে। ভাবছিলাম এ কয়দিনের কথা।

ছোট মেয়েরা যেমন ছেঁড়া দড়ির টুকরো কুড়িয়ে পুতুলের মাথায় জুড়ে দেবার জন্য বেণী রচনা করে, তেমনিভাবেই কল্পনায় কাহিনী রচনা করতে চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ একটা কলরব এসে কানে পৌঁছল। অনেক লোক যেন একসঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলছে। নিস্তব্ধ রাত্রে বহুজনের এই মৃদুস্বরে গুঞ্জন একটা আতঙ্কজনক রহস্যের সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে উঠে বাইরে এলাম। ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই রাত্রির স্তব্ধতাকে সচকিত ক'রে বেজে উঠল শিঙে এবং নাকাড়া। সমস্ত শরীরের প্রতিটি রোমকূপে একটা শিহরণ অনুভব করলাম। নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রে আদিকালের ওই বাদ্যযন্ত্রের তীব্র উচ্চ শব্দ বনভূমির পল্লবের ছত্রে ছত্রে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। গঙ্গার বাঁকে বাঁকে দূর হতে দূরান্তে পর পর প্রতিধ্বনিত হয়ে ছুটে গেল। গাছে গাছে পাখীরা কলরব ক'রে উঠল। কতকগুলি বাদুড় গঙ্গার এপার থেকে ওপারে উড়ে চ'লে গেল। কুকুরগুলো ঊর্ধ্বমুখ হয়ে ওই শিঙাধ্বনির মতই দীর্ঘস্বরে ডেকে উঠল। নেমে এলাম সরাইখানার দাওয়া থেকে। দাওয়ায় যারা ঘুমচ্ছিল, তারা উঠে বসেছে দেখলাম। হঠাৎ অন্ধকার পথে কেউ যেন দ্রুত চ'লে আসছে ব'লে মনে হ'ল। থমকে দাঁড়ালাম। প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম—কে? কিন্তু তার আগেই অন্ধকারের মধ্যে পায়ের হাড় ফোটার শব্দ পেলাম—মট-মট-মট-মট! 'কে' না ব'লে একেবারেই প্রশ্ন করলাম, কপিল? ছুটে যাও কোথায়?

কপিলও থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ভীত কম্পিত স্বরে সে প্রশ্ন ক'রে উঠল, কে?

আমি হে। চিনতে পারছ না?

খুব কাছে মুখ নিয়ে এসে দেখে সে ঘৃণায় বিরক্তিতে ক্ষোভে অধীর হয়েই যেন ব'লে উঠল, আঃ, ছি ছি ছি! আঃ! ছি!

কি হয়েছে কপিল?—বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলাম।

উত্তরে সে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে ভয়ার্তস্বরে ব'লে উঠল, না না না। বলতে বলতেই সে আমাকে পাশ কাটিয়ে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেল। বুঝলাম, কপিল কোন মারাত্মক রকমের অন্যায় ক'রে পরিত্রাণের আশায় ছুটে পালাচ্ছে। অতি নিষ্ঠুর ক্রুর প্রকৃতির কপিলকে কোন বিশ্বাস নেই।

আবার শিঙা বেজে উঠল। শুনে বুঝতে পারলাম, শ্মশানে বাজছে। এগিয়ে গেলাম। চণ্ডালপল্লীটি দেখলাম স্তব্ধ, শ্মশানের কোন ধ্বনিতেই ওরা বিচলিত হয় না। দিব্যি ঘুমিয়ে রয়েছে। পল্লীটার প্রান্তেই গঙ্গার তটভূমির ঢালের আরম্ভ। ঢালের মাথায় এসেই দেখলাম, একটা চিতা দাউ দাউ ক'রে জলছে, সমস্ত শ্মশানটা রক্তাভ আলোয় ভ'রে উঠেছে। গঙ্গার স্রোতধারার খানিকটা অংশে লাল আলোর প্রতিচ্ছটা জেগেছে—শ্মশানের দক্ষিণ অংশে ঘন জঙ্গলটার মাথায় গিয়ে পড়েছে। সেই আলোতে দেখলাম, শ্মশানের বুকে অনেক মানুষ। স্ত্রী পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্মশানের টিনের চালাটিকে ঘিরে। তারা গুঞ্জন করছে। একজন মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে শিঙাতে ফুৎকার। একজন তারই সঙ্গে বাজাচ্ছে নাকাড়া।

নেমে গেলাম শ্মশানের বুকে। ওই জনতার মধ্যে। কে এল এমন সমারোহ ক'রে? খোল বাজিয়ে আসা দেখেছি, হিন্দুস্থানীদের দেখেছি ঢোলক করতাল বাজিয়ে শবদেহ নিয়ে যায়, এমন শিঙা নাকাড়া বাজিয়ে কে এল বা কে যাচ্ছে দেখবার কৌতূহল হ'ল। শ্মশানের বুকে এসে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এ কি! এরা যে সকলেই পাটনী—পাটনীপল্লীটা প্রায় গোটাই ভেঙে এসেছে। শ্মশানের বুকে যেটা জলছে সেটা কোন চিতা নয়। চিতার পোড়া কাঠ স্তূপীকৃত ক'রে স্থানটাকে আলোকিত করবার জন্য জ্বালানো হয়েছে।

সন্তর্পণে এগিয়ে গেলাম। সম্ভবত পাটনীদের কোন পার্বণের সমারোহ।

* * *

পার্বণ নয়। দণ্ডধারী বৃদ্ধের অন্তিমক্ষণ উপস্থিত হয়েছে অকস্মাৎ। একজন বললে দণ্ডধারী 'পেস্থান' করছে। এ সমারোহ তারই।

বৃদ্ধ অসুস্থ হয়েছিল কয়েক দিন ধ'রে। গত রাত্রি থেকে উঠতে পারে নি। সন্ধ্যা থেকে হাঁপানী উঠে অবস্থা অকস্মাৎ খারাপ হয়ে পড়েছে। শ্মশানের পালিদার অবস্থা বুঝে খবর দিয়েছে পাড়ায়। সকলে এসে দেখে তার যাত্রার আয়োজন করেছে। স্তিমিত-নেত্র বৃদ্ধ প্রায় অসাড় হয়ে প'ড়ে আছে,—নাকের পেটি দুটো ফুলছে, কঙ্কালসার বুকটা দুলছে, এ ছাড়া আর কোথাও কোন স্পন্দন নাই। ওই স্পন্দনটি কখন থামবে সেই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে পাটনীপল্লীর সকলে। মধ্যে মধ্যে শিঙা নাকাড়া বাজিয়ে ঘোষণা করছে—দণ্ডধারী প্রস্থান করছেন।

একজনকে প্রশ্ন করলাম, এবার কে দণ্ডধারী হবে?

সে বললে, কপিল হবে দণ্ডধারী।

চকিতে আমার মনে পড়ল কপিলের দ্রুতপদে আমাকে অতিক্রম ক'রে যাওয়ার কথা।

একজন বললে, সে লুকিয়েছে।

লুকিয়েছে কেন?

লুকুতে হয়।

লুকুতে হয়?

হ্যাঁ। এই নিয়ম। লুকিয়ে এক ব'সে জায়গায় কাঁদতে হবে। 'তা' পরে শ্মশানে এসে দণ্ড ধরবে।

কতক্ষণ ছিলাম শ্মশানে তা বুঝতে পারি নি। কিন্তু গঙ্গার অপর পারে আকাশে আলোর সুস্পষ্ট আভাস জেগে উঠতে বুঝলাম, রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। বৃদ্ধ দণ্ডধারীর কত পুণ্য জানি না, তবে তার মৃত্যুর কষ্ট যেন আর সহ্য করতে পারছিলাম না। বৃদ্ধ তিল-তিল ক'রে মরছে।

বুকের সঙ্গে কণ্ঠনালীর সংযোগস্থলে গোলাকার স্থানটির মধ্যে [illegible] স্পন্দন ধুকধুক করছে এখনও।

শিঙা নাকাড়া সমানে বেজে চলেছে।

ফিরে দাওয়ায় উঠছি, কেউ ডাকলে, বাবু, দাঁড়াও।

দেখলাম, কপিল ফিরে আসছে। মুখ চোখ থমথম করছে তার।

হেসে বললাম, লুকানো হ'ল? ফিরলে? কাঁদা হয়ে গেল?

হ্যাঁ, হ'ল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে কপিল। তারপর বললে, তুমি জানলে কি ক'রে বল তো?

বললাম, শ্মশানে পাটনীরাই বললে।

কপিল একটু চুপ ক'রে থেকে হেসে বললে, দাঁড়াও, তোমাকে পেনাম করি।

কেন? প্রণাম কেন?

দেবতার ভর হয়েছিল যে তোমার মাঝে।

দেবতার ভর হয়েছিল আমার মাঝে?

হ্যাঁ, তুমি জান না।—কপিল আমাকে প্রণাম ক'রে চ'লে গেল দ্রুতপদে। তার পায়ের হাড় মট-মট করছিল। কিছুক্ষণ পরেই শ্মশানে উচ্চরবে বেজে উঠল শিঙা নাকাড়া। বহু কণ্ঠের ধ্বনি উঠল—রাম নাম সত্য হায়। বল হরি হরি-বোল!

বুঝলাম, দণ্ডধারী প্রস্থান করলেন এতক্ষণে।

ওদিক দিয়ে একটি শববাহকের দল ঢুকল সরাইখানার সম্মুখের পথটার উপর। বল হরি হরি-বোল। সঙ্গে অনেক লোকজন, সাজ-সজ্জা অনেক। নতুন দণ্ডধারীর প্রথম শিবলোকের যাত্রী।

খাট বিছানা, শবের আচ্ছাদনবস্ত্র, মূল্যবান শাল দেখে পাটনীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল—কপিলের ভাগ্য ভাল। প্রথম শব থেকেই দণ্ডধারীর

ভাগ্য নির্ণয় হয়। শবটিকে খাট সমেত নামিয়ে রাখতে হ'ল। মৃত দণ্ডধারীর চিতা নিববে, সেই চিতা থেকে আধপোড়া বাঁশ নিয়ে নতুন দণ্ডধারী কাজ আরম্ভ করবে। গলায় মালা প'রে, কপালে গঙ্গামাটির ফোঁটা দিয়ে, সদ্যস্নাত কপিল দাঁড়িয়ে ছিল বৃদ্ধের চিতার পাশে। তখন সূর্য উঠেছে, গঙ্গার ওপারের আকাশে সদ্য-প্রভাতের রক্তচ্ছটা সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয় নাই। সেই আলো এসে পড়েছে কপিলের মুখের উপর। কপিলের মুখের দিকে চেয়ে কপিলকে আমি সে-কপিল ব'লে চিনতে পারলাম না। এ যেন কোন নূতন মানুষ। পূর্বমুখে গঙ্গার পরপারের দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের দৃষ্টিতে পলক নাই, ভাব নাই, ভাষা নাই,—বিচিত্র সে নিষ্পলক দৃষ্টি।

দণ্ডধারীর চিতা নিবল।

পাটনীরা অধিকাংশই শ্মশান থেকে চ'লে গেল। নতুন দণ্ডধারী কপিল বললে, খাট থেকে খুলে মাটিতে যাত্রীকে শুইয়ে দাও মশায়েরা।

শববাহকদের দল থেকে এগিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। নিজেই তিনি খুলতে লাগলেন শবের বন্ধন। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন এসে তাঁকে সরিয়ে শবাচ্ছাদন মূল্যবান শালখানি কপিলের হাতে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অন্তরাত্মা আমার হাহাকার ক'রে উঠল। পনেরো-ষোল বৎসরের এক রূপবান কিশোর! সমস্ত শ্মশানটা সেই প্রভাতালোকের মধ্যেও চিতা-ভস্মের কালিমার প্রলেপে ধূসর কালিমায় লিপ্ত হয়ে গিয়েছে বলে মনে হ'ল।

আমি চোখ বন্ধ ক'রে শ্মশানের এক পাশে ব'সে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর চোখ খুললাম—কপিলের কণ্ঠস্বর শুনে। দেখলাম, সেই বৃদ্ধ কিশোরের চিতা প্রদক্ষিণ ক'রে মুখাগ্নি করতে উদ্যত হয়েছেন। নিঃসংশয়ে বুঝলাম কিশোরটির বাপ তিনি। কপিলের হাতে দেখলাম একখানা দশ টাকার নোট, কপিল গঙ্গার স্রোতের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে

চেয়ে বলছে—আমার আগুনের পুণ্যে, মা-গঙ্গার মহিমায় তোমার সকল পাপ থাকল এই চিতার ছাইয়ের তলায়। মা একদিন ভাসবেন, দুনিয়ার সকল ময়লামাটির সঙ্গে নিয়ে যাবেন তোমার পাপ ধুয়ে মুছে। তুমি যাও, শিবলোকে তোমার স্থান হবে, আমি বলছি—।

কপিলের পাশে স্তূপীকৃত হয়ে জমা হয়ে রয়েছে, খাট বিছানা শাল।

মুখাগ্নি করার পর কপিল চিতায় আগুন দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বললে, হাতে আঙটি রয়েছে, খুলে দাও।

বৃদ্ধ তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, থাক্ না।

না, থাকতে নাই। খুলে আমায় দাও।

বৃদ্ধ খুলে আঙটিটি কপিলের হাতে তুলে দিলেন।

কপিল ভাগ্যবান।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই উঠে এলাম শ্মশান থেকে।

সরাইখানায় এসে দেখি, বন্ধুরা স্টেশনে রওনা হয়ে গেছেন। ট্রেন ধরতেই হবে তাঁদের। আমি হিসেব ক'রে দেখলাম, আর গিয়ে ট্রেন ধরা সম্ভবপর নয়। সমস্ত রাত্রি জেগে শরীরও ক্লান্ত। আমি বিছানায় শুয়ে দেওয়ালের লেখা পড়তে লাগলাম। অনেক উপরে প্রায় চালের কাছে কেউ লিখেছে দেখলাম—"হে জীব, এখানে চিন্তা করবার অধিকার নেই।"

হাসি পেল।

এ কয় দিন ধ'রে অনেক দেখলাম আমি। হিসাবনিকাশ, ভাগাভাগি, দাবি-দাওয়া, না আছে কি? তবে কপিলের ভাগ্য ভাল। দণ্ডধারী হিসেবে পাওনা তার অনেক হবে। দণ্ডধারীদের মধ্যে সেই হতে পারবে রূঢ়তম দণ্ডধারী। এ বিষয়ে—

* * *

রাজ্যের ঘুম বোধ করি প্রতীক্ষা করেছিল চোখের পাতার প্রান্তে। ভাবতে ভাবতে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল অপরাহ্নে—পাঁচটা বেজে গিয়েছে। বিকেলের ট্রেনও ফেল করেছি। কাল সকাল ভিন্ন উপায় নাই। অগত্যা স্নান ক'রে আহারের ব্যবস্থা করলাম—চিড়ে, কলা, গুড়, দই। সন্ধ্যার পর গঙ্গার বালুময় গর্ভে বেড়ালাম খানিকটা। শুক্লপক্ষের সপ্তমী অষ্টমী হবে। চাঁদের আলো জলের স্রোতে চিকচিক করছে, তীরে বনভূমির মাথায় বালুরাশির উপর ছড়িয়ে পড়েছে সুখ-স্বপ্ন দেখে নিদ্রাতুর মানুষের মুখে ফুটে-ওঠা প্রসন্নতার মত। রাত্রি কত হয়েছিল খেয়াল ছিল না। নিশাচর পাখীর প্রহর ঘোষণায় খেয়াল হ'ল। ফিরলাম।

শ্মশানে ঢুকতে হ'ল।

কোন চিতা ছিল না। জনমানব নাই। বটতলায় সন্ন্যাসী পর্যন্ত নাই। কপিল বোধ হয় শ্মশানের ঘরে ঘুমুচ্ছে। আশ্চর্য এই ভূমিখণ্ডটি, যে ভূখণ্ডে সেই প্রবাদের কাল আজও অনড় হয়ে শিকড় গেড়ে এইখানে ব'সে আছে,—যে বিগত হয় না, যে চলে না, কোন কালে চলবে ব'লে মনেও হয় না।

হঠাৎ একটা মৃদু শব্দ কানে এল। গঙ্গার ঢেউয়ের আঘাতের শব্দ সম্ভবত। গঙ্গার স্রোতের দিকে তাকাতেই দেখলাম, কালো কিছু একটা যেন নড়ছে। কিছুক্ষণ চেয়ে দেখেই বুঝলাম, বস্তুটা সত্যই নড়ছে এবং সজীব কিছু ওটা। মানুষ ব'লেই মনে হ'ল। কে? কপিল নাকি? এগিয়ে গেলাম। চিনতে পারলাম না। লোকটা ঘাড় গুঁজে ব'সে আছে। সে অস্ফুট শব্দ করছে। কাঁদছে ব'লে মনে হ'ল।

কে? কপিল?

কপিলই। কপিল ধীরে ধীরে মুখ তুলে চাইলে আমার দিকে। আকাশের চাঁদের আলো তার মুখের উপর পড়েছে। তার চোখ থেকে

দুটি জলের ধারা সেই আলোর ছটায় ঝিকমিক ক'রে উঠল। মদেরও গন্ধ পেলাম।

তুমি কাঁদছ কপিল?

কপিল আমাকে চিনলে। হঠাৎ সে আমার সামনে নতজানু হয়ে জোড় হাত ক'রে বললে, আমি পালিয়ে যাচ্ছিলাম—সত্যিই পালিয়ে যেতাম। দণ্ডধারী হতে তো চাই নাই আমি। জানি, এ অনেক ভাগ্যের কথা। তবু আমি তো চাই নাই। তুমিই তো পথ আগলে দাঁড়ালে—'যে ভয়ে পলাও তুমি সেই দেবী আমি'র দেবতার মত। তুমি পথ আগলে না দাঁড়ালে আমি পালাতাম। জানি, মহাপাপ হ'ত। ওই দণ্ডধারীর প্রেত আমার পিছে-পিছে ছুটে বেড়াত। তোমার ডাকেই ফিরলাম। কিন্তু এ কেন হ'ল? এমন কঠিন ভাগ্যি আমাকে কেন দিলে? কেন হ'ল এমন? বল?

মদের নেশায় কপিল জানু পেতে ব'সেই টলছে। নেশায় চোখ দুটোতে লাল কুঁচের মত রঙ ধরেছে। কথার কতকটা বুঝলাম, কতকটা বুঝলাম না। তার হাত ধ'রে তাকে টেনে তুলে বললাম, ওঠ ওঠ। কি, হ'ল কি? তোমার ভাগ্য তো ভালই। পাওনা—

পাওনা? আমার দিকে সকরুণ ভাবে চেয়ে ঘাড় নেড়ে বললে, এমন পাওয়া তো আমি চাই নি দেবতা। ওই বুড়ো বাপের হাতে আগুন নিতে এল ওই ষোল বছরের ছেলে? আমাকে দিতে হ'ল বাপের হাতে আগুন জুগিয়ে? আমার দণ্ডধরার এই কি সাজা? এখানে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করতে হবে কার্তিকের মত ছাওয়ালদের, পিথিমী ছেয়ে যাবে অকালমরণে? না—না—না। তুমি হুকুম কর—আমি পালিয়ে যাই। জাহাজের খালাসীগিরি নিয়ে চ'লে যাই।

অবাক হয়ে গেলাম। এ তো সে কপিল নয়! স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কপিল কাঁদছে। গঙ্গার ছলছল ধ্বনির সঙ্গে যন্ত্রের সুরের সঙ্গে গায়কের স্বরের মত মিশে যাচ্ছে অদ্ভুতভাবে। মৃদু বায়ুপ্রবাহে গাছের পল্লব আন্দোলিত হচ্ছে, ঝাউবনে শব্দ উঠছে, তার সঙ্গে সে মিশে যাচ্ছে। তার কান্না আমার কোনকে, আমার অন্তরকে, আমার আত্মাকে, আমার দৃষ্টিকে অভিভূত আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল। আমার অন্তর, আমার দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সকল দৃষ্টির মধ্যে প্রসারিত হতে দেখলাম, অনুভব করলাম কপিলের কান্নাকে। চলমান কালের মধ্যেও যে কাল চলে না, যে কাল চলছে না—সেই কালের অধিষ্ঠানদেবী এই ভূমিখণ্ডটুকুর মোহ কিনা জানি না। যদি হয়, তাতেও আমার আক্ষেপ নাই। আমি কপিলকে হাতে ধ'রে তুলে বললাম, তোমার সঙ্গে আমিও প্রার্থনা করি, অকাল-মৃত্যুর গতি রুদ্ধ হোক।

তাকে গঙ্গার জলের কাছে এনে বললাম, নাও, মুখে হাতে জল দাও।

সে মুখ হাত ধুতে বসল।

হঠাৎ আমার নজর পড়ল—খুব কাছেই, স্বল্প স্বচ্ছ জলস্রোতের তলায় কি যেন চিকচিক করছে, তুললাম সেটাকে। একটা সোনার আঙটি। কপিল বললে, ফেলে দাও, সেই ছেলের আঙটি, আমি ফেলে দিয়েছি।

আমি হেসে সেই স্বল্প স্বচ্ছ জলের নীচেই রেখে দিলাম আঙটিটা। নেশা ভাঙলে কপিলের যা ইচ্ছে হয় করবে। তুলেও নিতে পারবে, আবার গভীর জলে ফেলে দিতেও পারবে।

বরমলাগের মাঠ

বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক শেষ হয়ে এল; মানুষের জীবনবাদের সুখনীড় দেউলে-পড়া বনিয়াদি ধনীর দালানের মত ফাটলে ভ'রে গিয়েছে, পলেস্তারা-খসা ইটের গাঁথুনির মসলার মধ্যে বট-অশ্বত্থের চারা শিকড় চালিয়ে দস্তুরমত মোটা হয়ে উঠেছে, বনেদের তলায়-তলায় ইঁদুরে সুড়ঙ্গ কেটে ধ্বংসে পড়ার পথ সুগম করেছে। লক্ষ্মীর কাঠের সিংহাসনে উই ধরেছে, গৃহদেবতা মানুষের ভাগ্য-বিপর্যয়ে রক্ষণাবেক্ষণের অক্ষমতা জানিয়ে প্রায় পুতুলে পরিণত হয়েছেন। অনেকে এখনও এইসব ঘরকেই মেরামত করবার জন্য মাল-মসলা প্রয়োগ ক'রে চলেছে, অনেকে নতুন ঘর গড়বার জন্য উৎসুক, তারা ঘরখানা আপনি ভেঙে পড়বে এই প্রত্যাশায় আছে। কিন্তু আদালত-এলাকায় গেলে এ সব কথা ভুলে যেতে হয়। সেখানে গেলে দেখা যায়, দেবতা ব'সে আছেন সনাতন রূপে। আইনের ঘরে এক চুল ফাটল দেখা যায় না; সেখানে ঢুকলেই মনে হয়, 'যাবৎ চন্দ্রার্ক মেদিনী' অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য মেদিনী যতকাল থাকবে, ততকাল এও থাকবে অক্ষয়। ভাঙা ঘরের মানুষেরা, তা সে যে দলেরই হোক, এখানে ঢুকলেই বদলে যায়। যারা ভাঙা ঘর মেরামতে বিশ্বাসী তারা বুকে বল পায়; যারা ঘর ভেঙে পড়লে বাঁচা যাবে মনে করে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে, ভড়কে যায়, অনেক ক্ষেত্রে পুরানো ঘরের লক্ষ্মীর উই-ধরা কাঠের সিংহাসনের উই ঝেড়ে তাতে বার্নিশ মাখাবার জন্য বার্নিশও সংগ্রহ ক'রে ফেলে।

শিবনাথ শেষের দলের মানুষ; আদালতে এসেছিল নেহাৎ দায়ে প'ড়ে, ফৌজদারী মামলার সাক্ষীর সমন পেয়ে। না-এলে গ্রেপ্তারি

পরওয়ানা বার হবার কথা। সাক্ষী দিয়ে ফিরবার পথে দেওয়ানী আদালতের দরজার মুখে এসে ভিড় দেখে দাঁড়াল। সেখানে চলছিল নিলাম। ওই লক্ষ্মীর সিংহাসনে দেবার বার্নিশ অথবা রঙ, যাই বলা যাক না কেন, তাই নীলাম হচ্ছিল। একের পর এক ডাকের উপর ডাক চড়ছে, ঘণ্টা পড়ছে। সিকি-টাকা দাখিল হচ্ছে। বাকি-খাজনায় জোত নিলাম হচ্ছিল। হঠাৎ কানে এল, এত নম্বর লাটের অমুক মৌজার রায়তিস্থিতিবান জোত, এত একর এত ডেসিমল জমি, খাজনা এত টাকা, ডিক্রীদার জমিদার অমুক, দেনাদার অমুক, দাবি এক শত কয়েক টাকা কয়েক আনা কয়েক পাই। ডাক আরম্ভ হয়ে গেল। জমিদার ডাকলেন তাঁর দাবিভোর, অর্থাৎ তাঁর দাবি পর্যন্ত। শিবনাথের কি হয়ে গেল। মৌজাটা তার গ্রামের বাড়ির কাছেই, মৌজাটির জমির উর্বরতা সম্বন্ধে খ্যাতি আছে এবং জমির পরিমাণের অনুপাতে খাজনা নিতান্তই কম। সে নতুন জীবনবাদে বিশ্বাসী, সে বিশ্বাস করে—লাঙল যার জমি তার হওয়াই উচিত, এবং নিজে সে কখনও লাঙল ধরবে না এও সে জানে, তবু কি যে হ'ল তার, জমিটা নিলামে সে ডেকে ফেললে। লাট কাষ্টগড়ায় মৌজা গোপের গ্রামে বরমলাগের মাঠ, বারো শো পঁচিশ টাকায় আঠারো বিঘা জমি, খাজনা মাত্র দশ টাকা। বার্নিশের কোয়ালিটি ভাল, পরিমাণে অনেকটা, দামেও খুব সস্তা; লোভ সে সামলাতে পারলে না।

জমিদার শিবনাথের বন্ধু। তিনি হেসে বললেন, তুমি ব'লেই ছেড়ে দিলাম আমি। নইলে—। অর্থপূর্ণ হাসি হেসে কথাটা অসমাপ্তই রেখে দিলেন ওই আদালতের জনতার মধ্যে। তিনিই তাঁকে সাহায্য করলেন সিকি-টাকা দাখিল করা, রসিদ নেওয়া ইত্যাদি করণীয় কাজে। পেশকার থেকে পিওন পর্যন্ত এসে হাত পেতে দাঁড়ালে তাদের দাবির সঙ্গে শিবনাথের সামর্থ্যের একটা রফাও ক'রে দিলেন। বেরিয়ে এসে বললেন, ওটা আমি

খাস করব ব'লে অনেক তদ্বির ক'রে নিলামের ব্যবস্থা করেছিলাম। পশু-পক্ষীতে জানে না নিলামের কথা। নইলে যুদ্ধের বাজারে দশ টাকা মণ ধান বেচে চাষা বেটারা হয়ে উঠেছে টাকার কুমির। জমির নামে বেটাদের লঘুগুরু জ্ঞান লোপ পায়, হরিণ দেখে বাঘের জিভে জল পড়ার মত বেটাদের জিভে জল সরতে থাকে, ঠোঁট চাটে আর ডাক বাড়িয়ে চলে। এক এক ডাকে আমরা উঠি পাঁচ টাকা, ওরা উঠে অন্তত পঁচিশ টাকা। যাক, এখন বাকি টাকাটা দাখিল ক'রে দিয়ো। দেনাদার নাবালক, দেশ থেকেও পালিয়েছে, টাকা দাখিল হবার কোন ভয় নাই; সময়ে দখল নিয়ো। জমিতে হাজা-শুকো নাই। আমাকে কিন্তু খারিজ ফী-টা দিয়ো ভাই। আইনে অবিশ্যি উঠে গিয়েছে, কিন্তু ওটা আমাদের ধর্মত ন্যায়ত প্রাপ্য। সিকি আমি চাইব না তোমার কাছে, টাকাতে দু আনা, মানে পঞ্চাশটা টাকা আর গোমস্তাকে কিছু, নগদীর কিছু, মানে—গোটা পাঁচেক, আর নায়েবকে গোটা পাঁচেক। আর ভাই একটা খাসি। আমি অবিশ্যি একা খাব না। তোমাদের পাঁচজনকে নিয়ে বুঝেছ—। মিষ্ট হাসি হেসে পিঠ চাপড়ে সমাদর ক'রে জমিদার বিদায় নিলেন।

* * *

জমিদার লোভের পরিচয় অবশ্যই দিয়েছিলেন, কিন্তু মিথ্যে কথা বলেন নি। যথাসময়ে যথানিয়মে বিনা বাধায় জমি দখল হয়ে গেল। শ্বেতকায় মানুষদের সমুদ্রের মধ্যে জনহীন দ্বীপ জয় করার মতই ঢোল বাজল, পতাকা পোঁতা হ'ল; কিন্তু বাধাও কেউ দিলে না, পরাধীনতার বেদনাতেও কেউ কাঁদল না। শুধু গাঁয়ের চাষারা হুঁকো হাতে ক'রে গাঁয়ের ধারের তেঁতুল তলায় এসে দেখলে। কানে একবার আঙুল দিলে মাত্র, কারণ নিলামের ঢোলের বাদ্য অশুভ, ও শুনতে নাই। শিবনাথ নিজে যায় নাই এ ক্ষেত্রে, সে বাড়িতে খানিকটা উদ্বেগ নিয়ে ব'সে ছিল, খবরটা পেয়ে সে নিশ্চিন্ত হ'ল। যাদের জমি তারা সত্যই দেশত্যাগী। দুর্বলের পরওয়ানা

নিয়ে ধর্মাধিকরণের যে পিওন এসেছিল সে দাবি করলে, অন্তত এক টাকা বকশিশ তাকে দিতেই হবে। শিবনাথ তাকে খুশি হয়ে দু টাকা দিয়ে দিলে।

একা ব'সে থাকতে থাকতে হঠাৎ সোস্থালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে চার্চিল সাহেবের একটা মন্তব্য তার মনে প'ড়ে গেল। The brute fact is that socialism means *mismanagement, bad house keeping, incompetence and progressive degeneration*। লোকটার মত এমন সুন্দর দুর্মুখ বোধ করি পৃথিবীতে আজও জন্মায় নি। রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিয়ে কাব্য রচনা ক'রে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করেছেন, সীতারামের বিরহ নিয়ে বাল্মীকি লিখেছেন অমর কাব্য; কিন্তু জটিলা কুটিলা কি স্থর্পণখাকে নিয়ে যদি চার্চিল কাব্য লেখে তবে সে কাব্য সাহিত্যগুণে ভাগবত রামায়ণ বৈষ্ণবপদাবলীর সঙ্গে সমান আসন পাবে ব'লেই শিবনাথের দৃঢ় ধারণা হ'ল।

বাবু মাশায়!

নারীকণ্ঠের আহ্বান শুনে সচকিত হয়ে উঠল শিবনাথ।—কে?

আজ্ঞে মাশায়, আমরা।

দুটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। একজন অবগুণ্ঠনবতী প্রৌঢ়া, অপরজন অবগুণ্ঠনহীনা যুবতী। বহুদিন দেশছাড়া হ'লেও শিবনাথের চিনতে দেরি হ'ল না—হাড়ি বাউরী ডোম কাহার জাতির মেয়ে দুটি। মাথায় দুধের বড় ঘটি, একজনের হাতে একটি লাউ, অপরের হাতে একটি 'পাছুই' অর্থাৎ মাছের ছোট চুপড়ি।

কি?

একটি দুধ-ভরা ঘটি, লাউ, মাছের চুপড়িটি নামিয়ে দিয়ে যুবতীটি কোঁচড়ের আঁচল খুলে ঢেলে দিলে একরাশি চাঁপানটের শাক। বললে, বাবা পাঠিয়ে দিয়েছে। মা আর আমাকে বললে, মনিবকে দিয়ে আয় গিয়ে আর পেনাম ক'রে আয়। সে আসবে—

কে তোমার বাবা? এ সব আমায় কেন পাঠালে সে?

মেয়েটি হাসলে। সলজ্জভাবে বললে, আমার বাবার নাম বলরাম বাউরী। আপনি আমাদের লোতুন মনিব হলা কিনা তাই পাঠিয়েছে।

বিব্রত হ'ল শিবনাথ। কি বিপদ! হঠাৎ বলরাম বাউরীর সঙ্গে তার মনিব-চাকর সম্বন্ধ কেমন ক'রে গজিয়ে উঠল সে বুঝতে পারলে না। সে বললে, তোমাদের বোধ হয় ভুল হচ্ছে—

অবগুণ্ঠনবতী বার বার ঘাড় নেড়ে উঠল, তার অর্থ—না না না। ভুল হয় নি।

মেয়েটি স্পষ্ট ক'রে বললে, না, ভুল কেনে হবে মাশায়? আপনাকে কি আমি চিনি না? আপনি কলকাতাতে থাক। এবারে লোতুন জমি কিনেছ। সেই জমির দখল লেবার জন্যে আইচ এখানে। বাড়িতে মেয়্যা-ছেলা কেউ নাই। আপনকার নাম তো মুখে আনতে পারি না, লইলে তাও ব'লে দিতাম এইক্ষণে। সে মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল।

শিবনাথ কি বলবে ভেবে পেলে না।

অবগুণ্ঠনবতী ফিসফিস ক'রে বললে যুবতীটিকে,—ফিসফিস ক'রে বললেও শিবনাথ সে কথা শুনতে পেলে, বললে, আমি দুধ দিয়ে আসি, তু মনিবের ঘর দোর ঝাঁট দিয়ে মাছ বেছে দে।

মেয়েটি বললে, হোক।

শিবনাথ ব্যস্ত হয়ে বললে, না না না। ওসব তোমরা নিয়ে যাও। ওসব আমার দরকার নাই। ও নিয়ে আমি করব কি?

সে কথায় তারা কেউ কর্ণপাত করলে না। অবগুণ্ঠনবতী মেয়েটি চ'লে গেল, তরুণী মেয়েটি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। শিবনাথের কথার জবাব দিলে সেই, বললে, সেবা করবেন আপুনি ঘরের খাঁটি দুধ, এক ফোঁটা জল দিই নাই। ক্ষীর ক'রে [illegible] কচি লাউয়ের তরকারি খেলে জিভটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। মাগুরমাছ জুত করে

'আম্রা' করলে পাঁঠার মাসের চেয়েও ভাল লাগবে। চাঁপলটের শাকও খেতে খুব ভাল।

কি বিপদ! ভাল তো বুঝলাম। কিন্তু রাঁধবে কে আমার?

মেয়েটি খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। বললে, আমরা তো ছোটনোক মাশায়, নইলে না হয় 'এঁদেও' দিয়ে যেতাম। তা খাও যদি তো বলেন।

শিবনাথের কপালে সারি সারি কুঞ্চনরেখা দেখা দিল। মেয়েটির কথা হাসি অঙ্গ-হিল্লোল ক্রমশ যেন বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত মুখর এবং চঞ্চল হয়ে উঠছে।

শিবনাথ ভাবছিল, এ আপদকে অবিলম্বে কেমন ক'রে বিদায় করা যায়। আট-দশ বছর যাবৎ বিদেশবাসী হ'লেও এই শ্রেণীর নরনারীর প্রকৃতি ও পরিচয় তাঁর অজানা নয়। এরা সব পারে। সম্পদশালী উচ্চবর্ণের মানুষের চারি পাশে এরা মাছির মত উড়ে বেড়ায়। মনের মধ্যে দুর্বলতার ক্ষত আবিষ্কার করতে এবং সেখানে ব'সে বিষ সঞ্চারিত ক'রে দিতে ওই মাছির মতই এদের পটুত্ব এবং প্রবৃত্তি অসাধারণ ও স্বাভাবিক। জীবনে স্বভাব ছাড়া শিক্ষা-দীক্ষা নাই, সুতরাং উপদেশে ফল হয় না; মাছিকে যেমন তাড়ানো ছাড়া উপায় নাই, তেমনই এদের না তাড়িয়ে এদের হাত থেকেও পরিত্রাণ নাই। শিবনাথ বললে, আচ্ছা, থাকুক ওগুলো, তুমি যাও।

মেয়েটি হেসে বললে, দুধের সাথে ঘটিটা শুদ্ধু লেবা নাকি মাশায়?

শিবনাথ উঠল, নিজেই ঘটির দুধটা অন্য পাত্রে ঢেলে নিয়ে ঘটিটা নামিয়ে দিলে।

মেয়েটি এবার বললে, ঝাঁটা কই মাশায় আপনার?

ঝাঁটা কি হবে?

মেয়েটি বললে, ঘর-দুয়ারটা ঝাঁট দিয়ে সাফ ক'রে দিয়ে যাই।

কি বিপদ! শিবনাথ বিরক্ত হয়ে বললে, ঝাঁটার দরকার নাই। তুমি যাও।

তাড়িয়ে দিচ্ছ মাশায় ?

শিবনাথ মুখ তুলে তাকালে। চোখে চোখ পড়তেই সে খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বললে, তা তাড়িয়ে যদি দেবা, তবে না হয় ঝাঁটা মেয়েই দিয়ো, এখন ঝাঁটা কোথা তাই বল। মেয়েটা নিজেই খুঁজতে লাগল এবং অনতিবিলম্বে ঝাঁটাগাছটা আবিষ্কার ক'রে খসখস শব্দে বাড়িটার এক প্রান্ত থেকে ঝাঁটা বুলাতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

শিবনাথ রূঢ় কণ্ঠে বললে, শুনছ ! কি নাম তোমার ?

মেয়েটি বললে, ময়না। বাস্, তারপর সে ঝাঁটা টেনেই চলল, শিবনাথ আর কি বলছে সে কথা শোনবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করলে না। তার ক্ষিপ্র এবং সবল টানে ঝাঁটার মুখে ধুলো উড়ে সমস্ত বাড়িটাতে যেন কালবোশেখীর ঝড় তুলে ফেললে। বহুকাল, আজ ন-দশ বৎসর ধ'রে বাড়িতে স্থায়ীভাবে কেউ বাস করে না, মধ্যে মধ্যে দশ-পনেরো দিনের জন্য কি মাস খানেকের জন্য মেয়েছেলে আসে, কিন্তু এমন ভাবে পরিমার্জনা করবার প্রয়োজনই কখনও তারা অনুভব করে নাই। মেয়েটি বাড়ির এক প্রান্ত থেকে আরম্ভ করেছে, খানিকটা ঝাঁটা বুলিয়ে টানতেই ধুলোর এক-একটি ছোটখাটো স্তূপ হয়ে উঠছে, সে স্তূপটিকে সেইখানে ছেড়ে আবার টেনে চলছে। মেয়েটার চেহারা হয়েছে অদ্ভুত, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ধুলোর একটা লেপন প'ড়ে গেছে। মেয়েটা কি পাগল না কি ?

ঠিক এই সময়েই এসে উপস্থিত হ'ল সেই অবগুণ্ঠনবতী—মেয়েটির মা, তেমনিই যেন বলেছিল মেয়েটি। আর তাই-ই হবে। অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা থাকলেও খাটো কাপড়ে হাত পা ভাল ক'রে ঢাকা পড়ে নাই। কালো চামড়ার উপর বয়সের মালিন্য এবং কুঞ্চন এখন বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। সেও এসে দুধের খালি ঘটি নামিয়ে লেগে গেল মেয়ের সঙ্গে শিবনাথের ঘরের পরিচর্যায়। একটা ঝুড়ি খুঁজে এনে স্তূপীকৃত ধুলো-ময়লা

মাথায় ক'রে বাইরে ফেলে এসে বললে, ঘর হ'ল লক্ষীর আটন। সেই ঘরের দশা এমুনি ক'রে রেখেছেন মাশায়? আজ আর হ'ল না, কাল এসে জল দিয়ে ধুয়ে, নিকিয়ে-চুকিয়ে দিয়ে যাব। আসি আমি, হাত পা ধুয়ে আসি।

শিবনাথের বাড়ির পাশেই পুকুর, না, গ'ড়ে—পানায় ভরা পচা জলের ডোবা একটা। মা ও মেয়েতে তার খবরও রাখে। শিবনাথ অবশ্য বিস্মিত হ'ল না এতে। গ্রাম-গ্রামান্তরের পুকুরে মাছ গুগলি ঝিনুক সংগ্রহ করে এরা; পুকুরের পাড়ের উপর থেকে জঙ্গল কেটে জ্বালানির বোঝা মাথায় ব'য়ে নিয়ে যায়। সুতরাং শিবনাথের বাড়ির পাশে পুকুরের অস্তিত্ব ওদের গোচর থাকায় আশ্চর্য হবার কি আছে! কিন্তু এই যে অযাচিত সেবা, এর অর্থ কি? জমিটার সঙ্গে যে কিছু সংস্রব আছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কি সে সংস্রব? দিনকাল খারাপ, মেয়েটার বাপ কি প্রজাস্বত্ব দাবি করছে না কি? কোর্ফা বন্দোবস্ত গোছের কোন একটা কিছু? চিন্তিত হ'ল শিবনাথ।

মা ও মেয়েতে মুখ-হাত ধোয়ার বদলে স্নান ক'রে এসে দাঁড়াল। শিবনাথ চমকে উঠল।

এ কি, তোরা চান করলি এই গ'ড়েতে?

গা সুড়সুড় করছিল মাশায়। চানই করলাম।

সর্বনাশ! এই পচা জলে?

কিছু হবে না মাশায় আমাদের। ওতে আমাদের কিছু হয় না।—মেয়েটার মা ঘোমটার মধ্য থেকে ফিসফিস ক'রে বললে।

মা ঘটিগুলি তুলে নিলে, মেয়েটি একটি প্রণাম ক'রে সামনে উপু হয়ে ব'সে বললে, মুনিবানকে নিয়ে আসেন মাশায়। আমাদের মুনিবান খুব সোন্দর, লয় মাশায়? মেয়েটা নির্লজ্জার মত হাসতে লাগল।

মেয়েটির মা এবার প্রণাম ক'রে আবার সেই দীর্ঘ ঘোমটার মধ্য থেকে

সুস্পষ্ট ফিসফিস শব্দে বললে, ময়নার বাবা আসবে আপনকার চরণে পেনাম করতে।

*   *   *

ময়নার বাবা এসে প্রণাম করলে শিবনাথের চরণে। চমকে উঠল শিবনাথ সন্ধ্যার অন্ধকারে তাকে দেখে। বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছিল শিবনাথ। বাড়ির দরজার এক পাশে পথের ধুলোর উপরেই ব'সে ছিল সে। উবু হয়ে ব'সে হাঁটুর উপরে হাত দুটিকে ভেঁজে রেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে কিছু ভাবছিল হয়তো। প্রচুর ধেনো মদের গন্ধ থেকেই শিবনাথ তার অস্তিত্ব অনুভব করলে। নইলে কালো কাপড় এবং দেহবর্ণ অন্ধকারের সঙ্গে এমন মিশে গিয়েছিল এবং এমন স্থির হয়ে সে ব'সে ছিল যে, তাকে কোন জড় বস্তু ব'লে উপেক্ষা করাই ছিল স্বাভাবিক। মদের গন্ধে শিবনাথ নাক সিঁটকে চারিদিক চেয়ে দেখতেই তার নজরে পড়ল লোকটা। প্রথমটা মনে হ'ল, কেউ বোধ হয় মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে প'ড়ে আছে। বিরক্ত হয়ে সে রুক্ষ ভাষায় প্রশ্ন করলে, কে ? কে ওখানে ?

সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা কালো পাথরে গড়া মূর্তি যেন উঠে দাঁড়াল, কিংবা মাটির বুক চিরে কোন গুহাবাসী মানুষের কঙ্কাল রক্তমাংসে সজীব হয়ে উঠে এল। অন্ধকারের মধ্যেও তাকে খুব অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল না। খর্বাকৃতি মানুষটি, কিন্তু কাঁধ বুক হাত স্থূল কঠিন এবং তার মধ্যে একটা প্রচণ্ডতা আছে। শিবনাথ চমকে উঠল, প্রশ্ন করলে, কে ?

মোটা গলায় সে উত্তর দিলে, আজ্ঞেন, আমি বলরাম মাশায়।

সঙ্গে সঙ্গে সে ভূমিষ্ঠ হয়ে শিবনাথের চরণে প্রণত হ'ল। প্রণাম সেরে মুখটি ঈষৎ তুলে বললে, ছোঁব আজ্ঞেন ? চরণের ধুলো লোব ?

শিবনাথ এবার টর্চটা বের ক'রে জ্বাললে। তার আরক্ত চোখ দুটি সঙ্কুচিত হয়ে এল। মুখ সরিয়ে নিয়ে সবিনয়ে হেসে বললে, ওরে বাপ রে! ওটা 'ফুটায়েন' না মাশায়।

শিবনাথ মুগ্ধ হয়েছিল তাকে দেখে। হ্যাঁ, মুগ্ধই হয়েছিল। দৃষ্টির মধ্যে যে ভঙ্গি এবং সন্ধান থাকলে সকল রূপের মধ্য থেকে অপরূপকে আবিষ্কার করা যায়, তা তার ছিল। সে সবিস্ময়ে বললে, তুমিই বলরাম? একমুখ হেসে সে সবিনয়ে বললে, আজ্ঞেন হ্যাঁ। আমিই বলরাম মাশায়।

তুমিই বলরাম মাশায়? তা তুমি মহাশয় বটে।

বলরাম এবার লজ্জিত হ'ল। সে বুঝতে পারলে তার উক্তির ত্রুটি এবং মনিবের উক্তির রসিকতা। সলজ্জভাবে বললে, আজ্ঞেন না, আপনাকেই মাশায় বললাম মাশায়। তারপর নখ খুঁটতে খুঁটতে বললে, আমরা আপনাদের চি-চরণের দাস। আপনাদের দৌলতে আমাদের জেবন।

কথাগুলির মধ্যে, কণ্ঠস্বরের মধ্যে এতটুকু স্তাবকতার ভঙ্গি নাই, কৃত্রিমতার রেশ নাই, কপটতার ছাপ নাই। কথা শেষ ক'রে সে উঠে খানিকটা স'রে গিয়ে দাঁড়াল, এতক্ষণে তার প্রণামপর্ব শেষ হ'ল।

শিবনাথ বললে, এস। ভেতরে এস। সে উৎকণ্ঠিত হয়েছিল বলরামের বক্তব্য শুনবার জন্য। কি চায় সে? এ দেশের ভক্তির কথা তার অজানা নয়, এই দেশেরই মানুষ সে। কিন্তু তবু এতখানি ভক্তির আতিশয্য তার কাছে অস্বাভাবিক ব'লে বোধ হচ্ছিল। এর অন্তরালে অন্ধকারে-নিঃশব্দগতি শীতলস্পর্শ সরীসৃপের পাকের মত ভক্তির একটা জটিল বেষ্টনী রচিত হচ্ছে তার চারিদিকে ব'লে তার সন্দেহ হচ্ছিল। মুক্ত নির্বিকার যে ভগবান তিনিও নাকি ভক্তি-ডোরে এমন বাঁধনে বাঁধা পড়েন যে, তাঁর অক্ষয় ভাণ্ডারের কিছুখানি ক্ষয় না ক'রে পরিত্রাণ পান না।

পরিপূর্ণ আলোয় শিবনাথ তাকে দেখে আরও বিস্মিত হ'ল। লোকটি যেন একটা পুরাকালে-গড়া পাথরের মূর্তি, মাটির তলায় প'ড়ে ছিল বা প'ড়ে থাকে, ধুলার ছাপ সর্বাঙ্গে, পাথর লোহা বৃষ্টি শিলাপাতে ছোট বড় বহু

ক্ষতচিহ্নে চিহ্নিত। সবিস্ময়ে শিবনাথ বলরামের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মাথার চুলগুলি সব সাদা হয়ে গিয়েছে। মাথায় গামছার পাগড়ি ছিল ব'লে এতক্ষণ দেখা যায় নি। শিবনাথের চরণতলে ব'সে সম্মান প্রদর্শনের রীতি অনুযায়ী মাথার গামছার পাগড়ি খুলতেই শিবনাথের চোখে পড়ল তার মাথার সাদা চুল। শুধু তাই নয়, লোকটির চেহারাও যেন মুহূর্তে পাল্টে গেল। মুহূর্তপূর্বের ভয়াল রূপ তার ওই সাদা চুলের মহিমায় শোভায় সৌম্য সুন্দর হয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

বলরামই কথা আরম্ভ করলে, কথা আরম্ভ করবার জন্যই সে সবিনয়ে হেসে বললে, ভাল ছিলেন বাবু মাশায়? মা-ঠাকরুণ ভাল আছেন? ছেলেপিলেরা ভাল আছেন?

শিবনাথ সচেতন হয়ে উঠল বিস্ময়বিমুগ্ধতার আচ্ছন্নতা থেকে। হেসে সে বললে, হ্যাঁ। ভাল আছি এবং আছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি বল দেখি? কি কথা আমার সঙ্গে? ও-বেলা তোমার স্ত্রী এসেছিল, মেয়ে এসেছিল, দুধ-মাছ আরও যেন কি কি দিয়ে গেল। বাড়ি ঘরের ধুলো পরিষ্কার ক'রে গেল, আবার ব'লে গেল—কাল এসে ধুয়ে নিকিয়ে দিয়ে যাবে। ব্যাপার কি?

বলরাম বললে, আজ্ঞেন বাবু, আমি যে আপনকার চাকর হলাম। আপুনি আমার মনিব হলেন। [illegible] এ সব কাজ যে আমাদিগে করতে হয়।

বুঝলাম। কিন্তু হঠাৎ মনিব হলাম কি ক'রে?

বলরামের মুখ যেন শুকিয়ে গেল, সে শঙ্কিত শুষ্কস্বরে বললে, আমাকে কি জমি দিবেন না তা হ'লে?

জমি?

আজ্ঞেন হ্যাঁ। ওই বরমলাগের মাঠের জমি। আপনি কিনেছেন।

শিবনাথ সোজা হয়ে বসল। বললে, ও জমির সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি?

আজ্ঞেন বাবু মাশায়, আমিই ওই জমি 'ঠেকো' করি কিনা। আজ দু

পুরুষ ধ'রে আমরা ওই জমিতে খেটে 'প্যাটের রন্ন' জুটিয়ে আসছি। আপুনি আজ ছাড়িয়ে লেবেন মাশায় ?

ঠিকাদার। যাক, তবু রক্ষা। শিবনাথ তবু ভাবছিল। সে বিদেশবাসী, বৎসরের মধ্যে কদাচিৎ আসে। এর পর অবশ্য আসতে হবে, জমির টানেই আসতে হবে। বর্ষায় আসতে হবে, জমি চাষ হ'ল কি না দেখতে, মাঘে আসতে হবে ধান আদায় করতে। সঙ্গতিপন্ন ভাগীদার বা ঠিকাদার না হ'লে তার চলবে না। কে পাহারা দিয়ে ব'সে থাকবে, যাতে ঠিকা বা ভাগের ধান খেয়ে শেষ ক'রে না দেয় বলরাম! ঠিকা হ'লে অজন্মার বৎসরে এই বলরাম বাউরী কেমন ক'রে কোথা থেকে দেবে তার প্রাপ্য ধান ?

শিবনাথের নীরবতা দেখে হাত জোড় ক'রে বললে, আপুনি মারলে আমি ম'রে যাব। ওই জমি—। বলরামের চোখে জল এসে গেল, কথা শেষ করতে পারলে না সে, মাঝখানেই থেমে গিয়ে মোটা খসখসে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

শিবনাথ বললে, দেখ, তুমি দুঃখ ক'রো না। বুঝে দেখ তুমি। আমি হলাম বিদেশে-থাকিয়ে মানুষ। আমার ঠিকেদার দরকার—সদ্‌গোপ চাষী কি অবস্থাপন্ন লোক, যে আমার ধানটি আসবামাত্র দেবে, অজন্মা হ'লে ঘর থেকে দিতে পারবে।

আমিও দেব মাশায়। আপনার ধান আমি কখনও ভেঙে খাব না। দেবতার জিনিসের মত তুলে রাখব। অজন্মা হ'লে যা ধান হবে, আগে আপনার দেব। না পারি, ফিরে বছরে দেব।

শিবনাথ একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, দেখ, জমির তো দেশে অভাব নাই। বরং চাষ করবার লোকেরই অভাব হয়েছে। আমার জমি নাই যদি পাও—

বলরাম বললে, বাবু, ওই জমি আমার মা-লক্ষ্মী। দু পুরুষ ওই জমি

করছি। বরমলাগের মাঠ, লাগের বিষে হোথা ঘাস গজাত না, ধু-ধু করত।

শিবনাথ সচকিত হয়ে প্রশ্ন করল, কি, কি? লাগের বিষে ধু-ধু করত? মানে?

লাগ মাশায়—ব্রহ্মলাগ! সাপ। ভেষণ সাপ।

ও নাগ! ব্রহ্মনাগ!

আজ্ঞেন হ্যাঁ। সাপের সাপা। তার বিষে, ঘাস গজাত না ওখানে। ধু-ধু করত লাল পোড়ামাটির মাটির ডাঙা।

পুরাকালে-গড়া পাথরের দৈত্যমূর্তি কি ভৈরবমূর্তির মত অবয়ব বলরামের, তার হাতের তেলো দুখানিও সেই অনুপাতে গড়া; বরং লাঙলের মুঠো এবং কোদাল-কড়ুলের বাঁট ধ'রে বোধ করি অনুপাতের শোভনতাকে ছাড়িয়ে একটু বেশি স্থূল, বেশি চওড়া। হাতের তেলো দুখানিকে পাশাপাশি জুড়ে ঈষৎ বেঁকিয়ে সাপের ফণার মত ক'রে বললে, এই এমনি কুলোর মত ফণা মাশায়, ঘোর কালো—মা-কালীর অঙ্গের মত বরণ, সেই কালোর ওপর কুলোর মত ফণায় শ্বেতবরণ চক্কর! ভেতরের দিকটি—মানে, গলা পেট দুধের মত সাদা। ফণা তুলে দাঁড়াত মাশায়, মানুষের বুক বরাবর উঁচু হয়ে উঠত। লক্‌লক করত দুখানি জিভ। উদয়কালে একবার, আর একবার ঠিক 'সনজের' সময়। ওই ডাঙার ধারে গেলেই লোকে দেখতে পেত, ফণা তুলে সূর্যের পানে তাকিয়ে দুলছেন। বাঁয়ে একবার, ডাইনে একবার, মধ্যে মাঝে ছোবল দিয়ে ঝড়ার মত মাটিতে পড়ছেন 'সাঁট-পাট' হয়ে। ছোবল মারছেন না, সূর্যিদেবকে পেনাম করছেন। তিনিই ছিলেন ওখানে। তাঁর বিষে ওখানকার মাটি পোড়ামাটির মতন লাল হয়ে গিয়েছিল। ঘাস হ'ত না, জীব জন্তু মানুষ জন কেউ যেত না। ধু-ধু ধু-ধু করত। সেই ডাঙা আমার বাবা ভেঙেছিল মাশায়।

শিবনাথ স্তব্ধ হয়ে শুনছিল, ভাল লাগছিল তার, বলরামের গল্প বলার

ভঙ্গিটিও ভাল। কণ্ঠস্বরে বিপুল আবেগ সঞ্চারিত ক'রে, বিস্ফারিত চোখে আতঙ্কের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে হাত পা নেড়ে কথাগুলি ব'লে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, সে যেন সেই নাগকে চোখে দেখছে। শিবনাথেরও মনে হ'ল, এই সন্ধ্যার অন্ধকারের ভিতর সেও যেন দেখতে পাচ্ছে মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মনাগকে। আদিম কালের মানুষের মত অন্ধ বিশ্বাস ভ'রে এই অর্ধবন্য মানুষটির এই কাহিনী তাকে যেন মোহগ্রস্ত ক'রে তুলেছিল। বলরাম স্তব্ধ হতেই সে বললে, তারপর?

মৃদু হেসে বলরাম বললে, তারপর মাশায়?

হ্যাঁ, তারপর? মানে, তোমার বাবা ভেঙেছিল ওই ডাঙা। কিন্তু নাগ গেল কোথায়?

নাগ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমার বাবা কি নাগকে মেরেছিল?

ঘাড় নাড়লে বলরাম। বাবার সাধ্যি কি মাশায়? আমার বাবার বাবা। দুটি হাত জোড় ক'রে বলরাম কপালে ঠেকালে, সম্ভবত পিতামহকেই নমস্কার করলে।

বিদ্যা জানতেন তিনি। 'পেলয়' পুরুষ, এই লম্বা, এই বুকের ছাতি, মাথায় বড় বড় চুল, এই দাড়ি মোচ। এই আমাকে দেখছেন তো, আমার বাবা বলত, আমার চেয়েও একহাত লম্বা ছিল মাথায়। এই মোটা মোটা চোখ, রাগলে রাঙা কুচবরণ হয়ে উঠত। লোকে বলত 'ডাকিনী বাউরী'। নাম ছিল নটবর। তা সে নাম লোকে ভুলেই গিয়েছিল। এক বেদের মেয়ের সঙ্গে জোয়ান বয়সে হয়েছিল ভালবাসা। সেই দিয়েছিল তাকে 'কাঁউরে'র বিদ্যে।

বাউরীর ছেলে নটবর শাহী জোয়ান, শান্ত শিষ্ট মানুষ, চাষ করত। গিয়েছিল সদ্গোপ চাষী মনিব মহাশয়ের তত্ত্ব মাথায় ক'রে তার জামাই-বাড়ি। বিশ ক্রোশ পথ। জ্যৈষ্ঠ মাস; জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব সেখানে পৌঁছে দিয়ে,

বিদায়ের লাল গামছা মাথায় বেঁধে, আধুলিটি ট্যাঁকে গুঁজে পরের দিন ভোর ভোর বাড়ি ফিরবার জন্য বেরুল। দশ ক্রোশের মাথায় প্রকাণ্ড দু ক্রোশ লম্বা মাঠ। মাথার উপর সূর্য যেন জ্বলছে। আগুন যেন গ'লে গ'লে পড়ছে, মাঠের মাটি আগুনের মত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, বাতাসের প্রবাহের মধ্যে বিষ-নিশ্বাসের জ্বালা ব'য়ে যাচ্ছে। নটবর তারই মধ্য দিয়ে চলেছিল। ষষ্ঠীর দিন, বাড়িতে স্ত্রী অপেক্ষা ক'রে থাকবে, মনিববাড়ি থেকে রুটির প্রসাদ আনবে, শাশুড়ী আসবে কাঁকুড় আম তালশাঁস ভিজে-কলাই সাজিয়ে 'বাটো' নিয়ে, ফোঁটা দিয়ে হলুদ সুতো বেঁধে দেবে। দুটি ছেলে আছে বাড়িতে তারা থাকবে পথ চেয়ে। আট আনা বকশিশ পেয়েছে, তা থেকে দুখানি গামছা কিনে দেবে তাদের, কখনও সে গামছা তারা পরবে, কখনও মাথায় বাঁধবে, কখনও গায়ে দেবে চাদরের মতন। খাঁ-খাঁ করছে মাঠ, দূরে ঝিরঝির-ক'রে কাঁপছে আবছা অস্পষ্ট কিছু, তারই মধ্যে হনহন ক'রে চলেছিল নটবর।

রোদ বলেন, 'তাত' বলেন, ওসবে আমাদিগে কাবু করতে পারে না। জল ঝড় ওসবে আমাদের মাতন লাগে। কাবু করে 'পাথয়ে', তা আমরা বুঝতে পারি। বুয়েচেন কিনা!—বলরাম অহঙ্কারের সঙ্গে বললে। বললে, বলেন না কেনে—বলরাম, তু বেটাকে যেতে হবে এই রাত্রিতে দশ কোশ পথ। হনহন ক'রে চ'লে যাব। দেবতার নাম ক'রে 'অঙ্গবন্ধন' করব, নির্ভয়ে চ'লে যাব। আমার কত্তাবাবা ছিল অসুর। রোদ তাতকে সে ডরাবে কেনে? জনমনিষ্যি নাই মাঠে, গরু বাছুর পর্যন্ত দুপুরের আগেই ঘরে নিয়ে গিয়েছে রাখালেরা; খাঁ খাঁ করছে চারি দিক, ক্রোশ খানেক দূরে গেরাম। গেরামের গাছপালার মাথাগুলানে পর্যন্ত ধুলো লেগেছে, মনে হচ্ছে, যেন ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে; মনে হচ্ছে, যেন অনেক দূর, অনেক দূর—এ পথ আর ফুরোবার নয়। এই দু কোশ লম্বা মাঠের মধ্যে একটি বটগাছ। সেই গাছের তলায়, বুয়েচেন কিনা, আড়ে দীঘে বেবাক আলপথ এসে মিলেছে।

দীর্ঘ মাঠের মধ্যে একটি বটগাছ ছায়াছত্র বিস্তার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। মাঠখানার বুকের উপর দিয়ে যতগুলি পথ উত্তরে-দক্ষিণে পূর্বে-পশ্চিমে চ'লে গিয়েছে, সবগুলি স্বাভাবিকভাবেই উপনীত হয়েছে ওই বটগাছের তলায়। নটবরের গাছতলায় বিশ্রাম করবার ইচ্ছা ছিল না, সে চ'লেই যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখতে পেলে, গাছটার ও-পাশে একটি মেয়ে। কালো মেয়ে, কিন্তু নটবরের মনে হ'ল, এমন রূপ সে জীবনে কখনও দেখে নি। রূপ তার রঙে নয়, রূপ তার সর্বাঙ্গে,—দীঘল গড়নে, কোঁকড়া চুলে, টিকালো নাকে, টানা চোখে, রঙ কালো হ'লেও তার রূপের একটা ছটা আছে; সকল অঙ্গ সুন্দর না হ'লে এ ছটা কখনও ফোটে না। গাছ-কোমর বেঁধে কাপড় পরেছে, কাপড়খানা যেন পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে তাকে, লতা যেমন পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরে কচি কিশোর গাছকে। মেয়েটি গাছের ও-পাশে একটা উইঢিপির মত ঢিপির সামনে ব'সে শাবল চালিয়ে মাটি খুঁড়ছিল।

বটতলার ছায়ায় অঙ্গ জুড়িয়ে গেল, কিন্তু তার চেয়েও জুড়িয়ে গেল তার চোখ ওই কালো মেয়েটিকে দেখে। বরমলাগের ডাঙায় টিলার নীচে আছে ছোট একটি ঝরনা, তলায় কালো ঝিকমিকে বালি, তার উপর ছিলছিলে কাচস্বচ্ছ জল, ওই কালো বালির রঙ তার কাচের মত জলের সর্বাঙ্গে ফুটে থাকে। দুই কিনারায় বারোটি মাস সবুজ ঘাসের বেড়। মেয়েটিকে দেখে মনে পড়ল সেই ঝরনাটির কথা। দাঁড়াতে হ'ল নটবরকে। জোয়ান বয়স, অসুরের মত পুরুষ, সে কি এমন মেয়েটিকে দু দণ্ড চোখ ভ'রে না দেখে যেতে পারে? দেখতে দেখতে নটবরের ইচ্ছে হ'ল, দুটো কথা বলে, মেয়েটির গলার আওয়াজ শোনে। ইচ্ছে হ'ল, কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার মাথার কোঁকড়া চুলের বাস নেয় বুক ভ'রে। মেয়েটির কিন্তু কোন দিকে নজর নাই। সে ঢিপিটা খুঁড়ছেই। নটবর বুঝতে পেরেছিল, সে কি করছে। হাতে শাবল, পাশে বাঁশের শলার

ঝাঁপি, পিছন দিক থেকে গলার উপর দেখা যাচ্ছে কালো চকচকে পদ্ম-টাটির মালা, হাতে লাল সুতোয় জড়িবুটির তাগা। এ মেয়ে বেদের মেয়ে, ওই ঢিপিটার মধ্যে সাপের সন্ধান পেয়েছে। তাকে ডেকে কথা বলা এখন ঠিক হবে কি না, তাই ভাবছিল নটবর। ঠিক এই সময় গর্ত থেকে ফুঁসিয়ে বেরিয়ে পড়ল এক কাল-কেউটে। সঙ্গে সঙ্গে বেদের মেয়ে ওঠালে তার হাত। ও-দিকে ঠিক পাশের গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ল আর একটা কেউটে। এর পর কি হ'ল, সে আর দেখতে পেলে না নটবর। এতবড় পুরুষটা, ভয়ে সে চোখ বুজে ফেললে—আপনি যেন চোখের পাতা নেমে এল, বিদ্যুতের ছটার তেজ সইতে না পেরে চোখ যেমন আপনি বন্ধ হয়ে যায় সেই ভাবে। বুকের ভিতরটা চমকে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে বেদের মেয়ের গলার আওয়াজ শোনা গেল, ক্রুদ্ধ বাজপাখির ধারালো স্থচালো ডাকের মত সে আওয়াজ—এ-ই-ও!

তারপর আবার বেদের মেয়ের আওয়াজ পেলে সে, এবার আওয়াজ সে আওয়াজ নয়,—ব্যস্তত্রস্ত, কিন্তু সে আওয়াজ মিষ্টি, বললে, কে তুমি? ও ভাই! তারপরই সে হেসে উঠল খিলখিল ক'রে। ও মা! এতবড় মরদ, ভয়ে চোখ বুজেছ? খোল খোল, চোখ খোল।

চোখ খুলে নটবর শিউরে উঠল। বেদের মেয়ে দুই হাতে দুটো কেউটের মুখ চেপে ধরেছে, কিন্তু কেউটে দুটো নিষ্ঠুর পাকে জড়িয়ে ধরেছে তার লম্বা কালো হাত দুটি। পাকের ফাঁকে ফাঁকে হাতের মাংস ফুলে উঠেছে।

বেদের মেয়ে বললে, ঝাঁপির পাশে কাস্তে আছে, কাস্তে দিয়ে কেটে দিতে পারবে ডান হাতের সাপটাকে পাকে পাকে? শিগ্রি ভাই, নইলে হাতের মুঠো আর রাখতে পারব না। জীবনটা যাবে।

নটবর ছুটে গিয়ে নিয়ে এল কাস্তেখানা। সাপ দুটোর গলায়, বেদেনীর মুঠোর নীচে কাস্তে চালিয়ে দু টুকরো ক'রে দিলে। বেদেনী বললে,

এইবার এক কাজ কর ভাই, আমি সাপের মুখ দুটো ফেলব, কিন্তু ছুঁড়ে দূরে ফেলবার জোর নাই আড়ষ্ট হাতে। পড়বে পায়ের কাছে, তুমি আমাকে পিছন থেকে টেনে নিতে পারবে?

নটবর তার সামনে মেলে ধরলে তার মাথার নতুন লাল গামছাখানা; বললে, দাও, এতে ফেলে দাও, ঝোলার মধ্যে ভিক্ষের মত পড়বে।

বেদের মেয়ের নাম লালমণি।

কাটা সাপের বাঁধন কেটে হাত দুখানি মুক্ত হতেই বললে, কি তোমাকে দিব ভাই, আমি বেদের মেয়ে, কি-বা আমার আছে? তুমি আমায় বাঁচিয়েছ আজ।

নটবর বললে, কেনে ভাই, তুমি নিজেই হ'লে সাত রাজার ধন মানিক। আমার গামছায় দিয়েছ সাপের ফণা, সাপের ফণার মানিক তুমি, তোমাকে পেলে মাথায় নিয়ে আমি যে রাজা হতে পারি।

বেদের মেয়ের চোখ ঝকমকিয়ে উঠল। নটবরের বিশাল দেহখানার দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টিতে। তারপর হঠাৎ উঠে নটবরের গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে, আমার সোয়ামী নাই, কিন্তু বাপ আছে, ভাই আছে; তারা তো তোমাকে সইবে না। তুমি আমাকে তোমার ঘরে নিতে পারবে?

মাথায় ক'রে নিয়ে যাব।

ঘরে কে আছে তোমার?

পরিবার আছে, দুটি ছেলে আছে।

তবে তোমার ঘরে নয়। সতীন নিয়া ঘর করতি পারব না ভাই। দেশান্তরী হতে পারবে আমাকে নিয়া?

নটবর উঠে দাঁড়াল। বললে, চল, এখুনি পথ ধরি।

* * *

বলরাম বললে, সেই যে গেল কত্তাবাবা, পথে পথে বেদের

ময়ের সাথে ফিরল পনরো বছর পর। মাথায় লম্বা চুল, মুখে এই াড়ি-মোচ, হাতে লোহার তাগায় মাদুলী কবচ জড়িবুটি, গলায় দ্মটাটির মালা, কাঁধে একটা বাঁকে ঝোলানো বেদের ঘরের সাজসরঞ্জাম, চুমড়ী বাঁশী, বিষমঢাকির বাজনা, গর্ত-খোঁড়া শাবল, কি একটা াতার ডালের লাঠি, ঝাঁপিতে সাপ নিয়ে গেরামে ফিরে এল। কেউ চনতে পারলে না। দুই ছেলেকে রেখে গিয়েছিল সাত বছরের আর াঁচ বছরের—আমার জেঠা আর বাবা, তারা তখন জোয়ান হয়ে উঠেছে। রুর সেবার চাকরি ছেড়ে বাপের মনিব বাড়িতে চাষের মাইনে-করা কৃষাণ হয়েছে। বাপ রইল ছেলেদের দিকে চেয়ে, ছেলেরা রইল বাপের পানে তাকিয়ে, কেউ কাউকে চিনতে পারলে না। চিনতে পারলে যে চিনবার সে। পরিবার ঠিক চিনলে। ঘাটে গিয়েছিল জল আনতে আমার কত্তামা। সে জল-ভরা কলসী কাঁখে বাড়িতে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। কত্তাবাবার লম্বাচওড়া কাঠামোর দিকে তাকিয়েই সে বললে, কে গো তুমি?

নটবর হেসে বললে, আমাকে চিনতে পারছিস না বউ?

নটবরের স্ত্রীর কাঁকাল থেকে কলসীটা খ'সে প'ড়ে ভেঙে গেল, সে ছুটে পালিয়ে গেল।

ছেলেরা অবাক হয়ে গেল। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই তারা ব্যস্ত হয়ে মায়ের পিছনে ছুটে গিয়ে ডাকলে, মা! মা!

নটবরও এগিয়ে গিয়ে ডাকলে, বউ! বউ!

মা হেঁকে বললে, না, না।

নটবর বললে, বুঝেছি আমি, বুঝেছি। ফিরে আয় তু, ফিরে আয়। তোর দোয আমি ধরব না, আমার দোষ তুই ধরিস না।

নটবরের স্ত্রী দাঁড়াল এবার। বললে, মা-কালীর দিব্যি কর তুমি।

নটবর বললে, মা-কালীর দিব্যি।

ফিরল নটবরের স্ত্রী। ফিরে এসে বললে, এতকাল পরে কেনে ফিরলে তুমি?

নটবর বললে, পনরো বছরের বারোটা বছর মনের সঙ্গে যুঝে যুঝে আর পারলাম না বউ, এদিকে মা-কামিখ্যেও খালাস দিলেন, লালমণি ম'ল। আমি আর থাকতে পারলাম না; ফিরে এলাম।

নটবরের স্ত্রী বললে, ফিরে এলে; থাকতে পারবে? ভাল লাগবে?

নটবর পরিবারের দিকে চেয়ে হাসল, বললে, বললাম তো পনরো বছরের বারোটা বছর মনে মনে পুড়েছি 'ঘর ঘর আর ঘর' ক'রে। লালমণি তোকে ভুলিয়েছিল, ছেলে দুটোকেও ভুলিয়েছিল; কিন্তু ঘর ভুলাতে পারে নাই।

বর্ষার সময় ঝমঝম ক'রে জল নামত, আকাশ ঘোর ক'রে মেঘ আসত, গরগর ক'রে ডাকত। লোকের ঘরের দাওয়াতে, নয়তো কোন চালায় শুয়ে থাকত তারা। লালমণি বর্ষার আমেজে অঘোরে ঘুমাত। আশেপাশে ব্যাঙ ডাকত। মাথার শিয়রে ঝাঁপিতে নিশ্বাস পড়ত। নটবর ঠায় জেগে থাকত। ঘর মনে পড়ত; চাষবাসের কথা মনে পড়ত। কাড়ান লাগবে, জলে থৈ-থৈ করবে মাঠ, মাটি দলদল করবে, ভাই-বন্ধুরা চাষ করবে, সেই সব মনে পড়ত। অঘ্রাণ পোষ মাসে ধান উঠত, নটবর উদাস হয়ে যেত। কিন্তু সে কথা বলবার জো ছিল না লালমণিকে। সে জানত কাঁউরের ডাকিনীর মন্তর; নটবরকে মন্তর শিখিয়েছিল, বিদ্যা দিয়েছিল; কিন্তু সব দেয় নাই, পাছে তার মন্তরের মায়া কেটে সে পালায়, তাই দেয় নাই। পালালে নটবরকে মেরে ফেলত বাণ মেরে কি নাগ ছেড়ে দিয়ে। যেখানে যাক না কেন, সে নাগ তাকে না-মেরে ছাড়ত না। লোহার বাসরঘরের সরষে-প্রমাণ ছিদ্র বিষ নিশ্বেসে বড় হয়েছিল। সেই পথে ঢুকে লখাইকে ডংশেছিল কালীনাগ। তেমনই ক'রে ঘরে হোক, গাছে হোক, পাহাড়ের আড়ালে হোক যেখানে থাকত, ডংশাতো নটবরকে।

তা ছাড়া— কথা বন্ধ ক'রে নটবর একটু একটু হাসলে।

ছেলেরা পরিবার অবাক হয়ে শুনছিল নটবরের কথা। তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইল নটবরের মুখের দিকে। নটবর হাসিমুখেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, তা ছাড়া তার সে মন্তরের মায়া কাটাবার ক্ষ্যামতাই আমার ছিল না। লালমণি সে বিদ্যেটুকু আমাকে দেয় নাই। তার মুখের দিকে চাইলে আর চোখ ফেরাবার মত দুনিয়াতে কিছু খুঁজে পেতাম না। সব ভুলে যেতাম। তবে লালমণি আমার মনের কথা বুঝত। মধ্যে মধ্যে বলত, বল, কি চাও তুমি ? আমি বলেছিলাম, এক জায়গায় একখানি ঘর করি, সংসার পাতি।

লালমণি বলত, তারপরে ?

আমি খাটব-খুটব, চাসবাস করব, ভদ্দলোকের জমি ভাগে কি কৃষাণিতে নেব ; চ'লে যাবে দিন সুখে স্বচ্ছন্দে।

কিন্তু লালমণির পছন্দ হ'ত না। একবার এক জায়গায় এক বাবু মহাশয়দের বাড়িতে সাপ ধরেছিল তারা; সাপের উপদ্রবে বাড়িতে বাস করতে পারছিলেন না তাঁরা। তাঁদের বাড়িতে সাপ ধরলে দুজনে। তাঁরা থাকতে একখানি বাড়ি দিলেন। লালমণি সেবার হেসে বললে, তাই কর, এবার তোমার যা ভাল লাগে তাই কর। নটবর বাবুদের বাড়িতে কৃষাণি নিলে। ভারি আনন্দ। চাষ হ'ল। আষাঢ় শাওন ভাদ্র আশ্বিন কাত্তিক ; অঘ্রাণে ধান পাকল, পৌষে ধান উঠল। ধানের ভাগের সময় ক্ষেপে গেল লালমণি। মনিবদের দু ভাগ, নটবরের এক ভাগ দেখে মুখ ভার করেছিল সে ; কিন্তু হিসেবনিকেশ ক'রে সে এক ভাগেরও যখন বারো আনা চ'লে গেল, তখন সে হনহন ক'রে পালিয়ে এল খামার থেকে। কিছুক্ষণ পরই তখন সন্ধ্যে হয়েছে, একজন এসে নটবরকে খবর দিলে, তার ঘরে আগুন লেগেছে। নটবর ছুটে গিয়ে দেখলে, ঝোলা ঝুলি ভার বাঁক উঠানে বার ক'রে জ্বলন্ত ঘরের দিকে চেয়ে লালমণি দাঁড়িয়ে

আছে। মুখে রা নাই, বোল নাই, নটবর কাছে এসে দাঁড়িয়ে শুধু শুনতে পেলে দাঁতে দাঁতে ঘ'ষে নিষ্ঠুর একটা কিসকিস শব্দ করছে লালমণি। নটবরকে বললে, ধান যা পেলি বেচে আয়, বাঁক কাঁধে নে, চল্।

নটবর বুঝলে সব। ঘরে আগুন লালমণি নিজেই দিয়েছে। সেই আগুনের লালচে আভা পড়েছিল লালমণির মুখে, সেই মুখ দেখেই বুঝলে সব। শুধু তাই নয়, সে মুখ দেখে ভয় হ'ল নটবরের। লালমণির সাদা চোখে লালচে আগুনের ছটার সঙ্গে কুহকী বিদ্যার মৃত্যুবাণও যেন ঝিলিক মারছে ব'লে মনে হ'ল। লালমণি আবার আঙুল দেখালে বাঁকের দিকে। বললে, তোল্, ঘাড়ে তোল্।

নটবরকে ঘাড়ে তুলতে হ'ল বাঁকে-বাঁধা সংসার, আবার ধরতে হ'ল পথ। পথে লালমণি বললে, আবার যদি কোন দিন বলবি—ঘর বাঁধব, চাষবাস করব ; মুখের ডগাতেও যদি আনবি তো আকামা সাপ দিয়ে তোর মাথার তালুতে ডংশাব, ব'লে দিলাম। ঘুমিয়ে থাকবি আর উঠবি না। 'শিরে হৈল সর্পাঘাত তাগা বাঁধবি কোথা ?'

তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে বললে, যে কুকুর এঁটো পাত একবার চাটে, সে কথনও তার লোভ ছাড়তে পারে না। চাষা-বাউরী চাষের গোলামির রস ছাড়তে পারলি না।

আবার বললে, আমি মুনির মন ভুলাতে পারি কুহকী বিদ্যায়, তোকে ওই রস ভুলাতে লারলাম।

নটবর স্ত্রীকে বললে, লালমণি মরল সেদিন—সাপের বিষেই মরল। ভেবেছিলাম, পথে পথেই কাটাব জীবনটা। কিন্তু তা পারলাম না। ফিরে এলাম। বুড়ো বয়েসটা ঘরের আরামের লোভ সামলাতে পারলাম না। বড়ই সাধ—চাষ আবাদ করব। ফসল কুটো হবে, নাতিপুতি হবে। তাই ফিরে এলাম।

নটবরের স্ত্রী কাঁদছিল।

নটবর বললে, কাঁদিস না। গাঁয়ে এসেই খোঁজ নিয়েছি সব। যখন শুনলাম, তুই আর সাঙা করিস নাই, তখনই মনে মনে তোকে আশীর্ব্বাদ করলাম। সাঙা করলে তো চুকেই যেত সব। অন্য সোয়ামির ঘর করতিস ছেলেপিলে নিয়ে। এ দুটোকে ভগবান বাঁচাতেন তো বাঁচত, নইলে মরত। লোকে বললে—মনিবের নজরে পড়েছিলি, তাকেই ভ'জেই আছিস, ছেলেরাও কাজ করছে মনিব-বাড়িতে। তা বেশ করেছিস। ওতে আমি রাগ করি নাই।

হঠাৎ হেসে নটবর বললে, মনিব-বাড়িতে যখন জমি ভাগে নিই, তখন আমিই তো তোকে দশবার ক'রে পাঠাতাম মনিব-বাড়ি ছুতো-নাতা ক'রে।

নটবরের স্ত্রী এবার গাল দিতে দিতে উঠে গেল।—মরণ হাঘরে, মাগীর সঙ্গে থেকে সহবৎ হয়েছে দেখ। মুখে আর আটকায় না কিছু। ছেলেরা ব'সে রয়েছে, আর—। মর্ মর্ মর্ বাউণ্ডুলে বুড়ো।

নটবর এবার ছেলেদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করলে। বড় ছেলের চেহারা ঠিক তার মত হয়েছে। তেমনই লম্বা চওড়া, তেমনই চওড়া বুক। তাকে আদর ক'রে পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, চাষ করতে পারছিস? দুপুরে কতটা জমি চষতে পারিস?

ছেলে সলজ্জভাবে বাপের হাতের তাগা নাড়তে নাড়তে বললে, তা পারি বইকি অনেক।

নটবর বললে, তাগা নেড়ে দেখছিস? তা তোকে এ বিদ্যা দোব আমি।

ছোট ছেলে অর্থাৎ বলরামের বাপকে কাছে নিয়ে বললে, এ বেটা মাথাতে খাটো হয়েছে।

* * *

বরমলাগকে পূজো দিত নটবর। নটবরের নাম তখন ডাকিনী

বাউরী হয়ে গিয়েছে। জাত গিয়েছে, হাঘরে বেদের মেয়ের সঙ্গে পনরো বছর বসবাস করেছে, জাতি-জ্ঞাতিরা বললে—আমরা মার্জনা করলেও দশখানা গাঁয়ের স্বজাতিরা মার্জনা করবে না। তোমার ছেলের বিয়ে হবে না।

ডাকিনী বাউরী বললে, কুছ পরোয়া নাই। আমি আলাদা থাকব। গাঁয়ের ধারে ঘর তুলব।

তাতে কেউ আপত্তি করলে না। হাজার হ'লেও গুণীন মানুষ। কত উপকারে লাগবে। তা ছাড়া, ভয়ও আছে। কুহকী বিদ্যায় অঘটন ঘটাতে পারে ডাকিনী বাউরী। রোজ সকাল আর সন্ধ্যায় ব্রহ্মনাগ মানুষের বুকভর উঁচু হয়ে পূর্ব ও পশ্চিমের লাল আকাশের দিকে চেয়ে হেলত, দুলত, ডাকিনী ডাঙার ধারে দাঁড়িয়ে দেখত; নাগ চ'লে যেত, সেও প্রণাম ক'রে ফিরে আসত।

বলরাম বললে, তেমন বর্ষা মাশায় সেকালের লোকে কেউ দেখে নাই। একাল পর্যন্তও হয় নাই। তেরশো চল্লিশ সালে—কঙ্কণ গেরামে গেরনের বারে বর্ষা নেমেছিল, এই সেবারে সাইকোলোন হয়েছিল, সে সবও তার কাছে কিছু লয়। সে যেন মেঘ সুদ্ধ আকাশ পৃথিমীর উপর ঝাঁপিয়ে ভেঙে পড়ল। বরমলাগের মাঠ ছিল কাঁকরের ঢিপি। সেই ঢিপি থেকে চারিপাশে জলের ঢল নামতে লাগল হুড়হুড় ক'রে নদীর মত তোড়; লালমাটি-গলা জল রাঙা হয়ে গেল, গোটা সমতল চাষের মাঠ লাল জলে থৈ-থৈ করতে লাগল। লাল মাটির চাঙড় খ'সে পড়তে লাগল—নদীর কিনারার ধ্বসের মতন। বর্ষা শেষ হ'লে অবাক কাণ্ড।

বর্ষার শেষে লোকে সবিস্ময়ে দেখলে, বরমলাগের ডাঙার কিনারা ধ্ব'সে গিয়ে তলায় বেরিয়েছে অপরূপ মাটি—মাখনের মতন নরম,

দুধের মত রঙ। শুধু তাই নয়, সে মাটিতে দূর্বাঘাস বেরিয়েছে। এক বিঘৎ পুরু হয়ে উঠেছে মৃত্তিকার উর্বরতায়, ঘন সবুজ লাবণ্যে ঝলমল করছে।

সে ঘাসের লোভে একটার পর একটা ক'রে পাঁচটা গরু মারা পড়ল বরমলাগের দংশনে। লোকে সাধ্যমত আগলে রাখত, কিন্তু তবু দূর থেকে ওই সবুজ ঘাসের লোভে গরু ছুটে গিয়ে পড়ত। রক্ষকের অন্যমনস্কতার অবসরে ছুটে যেত, কয়েক মুহূর্ত পরেই চীৎকার ক'রে উঠত, খানিকটা ছুটে এসেই ব'সে পড়ত, ওদিকে দেখা যেত বরমলাগ ভাঙনের তলা থেকে উঠে যাচ্ছে টিলার উপর। সে বিষের প্রতিকার ডাকিনী বাউরীও করতে পারলে না। সে গাঁয়ের লোককে বললে, বরমলাগ শিবের গলার পৈতে, লাগের নিশ্বেস প'ড়ে শিবের নাকে যায়, তাতেই বাবার চোখ হরদম ঢুলুঢুলু। ওর পিতিকার নাই, যমের যমদণ্ডের কাঁটা নিয়ে ওর দাঁত তৈরি হয়েছে। তোমরা বাপু নিজেরা সাবধান হও।

নাগের ডাঙার কাছে দাঁড়িয়ে জোড় হাত ক'রে বললে, তুমি যখন দেবতা, তখন অবোলা জীবের অপরাধ নাও কেনে? যিনি যমরাজা তিনিই ধর্মরাজ। অধর্মের কাজ তো তিনি করেন না! তা ছাড়া, গরু মা-ভগবতী, ওই গরুর ক্ষুরের ছাপ নিয়ে তোমার ফণা তৈরি। ওই মায়ের দুধেই তোমার সবচেয়ে তৃপ্তি। বাবা শিবের বাহন, তোমার মাহিত্ম্যি যেমন, গরুর মাহিত্ম্যিই তেমনই। মা-বসুমতী বুকে ঘাস গজিয়েছেন, ওই সুরভি মায়ের ভোগের জন্যে। গরুর দোষ কি? এমন ক'রে ক্রোধের মাথায় গোহত্যে ক'রো না তুমি। 'ক্রোধ' সামলাও, সম্বরণ কর।

বলতে বলতে সে এক-পা এক-পা ক'রে এগিয়ে গেল। এগিয়ে গেল ভাঙনের দিকে। প্রায় দু কাঠা জমি। কাঠা দুয়েক জমির উপরের লাল মাটির স্তরের চাপ ভেঙে গ'লে স'রে গিয়ে সেখানে বেরিয়েছে মাখনের মত নরম মাটি। তার মধ্যে চাপড়াবন্দি হয়ে দূর্বাঘাস বেরিয়েছে, মধ্যে মধ্যে খালি জায়গায় বেরিয়ে আছে সেই মাটি। এক মুঠো মাটি হাতে নিয়েছে,

অমনি গর্জন উঠল। টিলার উপরের কোন খন্দক থেকে মাথা তুলে উঠল বরমলাগ।

ডাকিনী বাউরীও ডাকিনী বাউরী। বললে, তুমিও লাগ, আমিও মানুষ। তুমিও বরমলাগ, আমি ডাকিনী বাউরী। আমি অনিষ্ট করতে আসি নাই তোমার। তুমি বিনা দোষে আমার অনিষ্ট করলে, আমার হাতেও সর্পনাশা ডালের দণ্ড আছে।

কিন্তু বরমলাগ মানলে না। মাথা তুলেই সে সরসর ক'রে নামতে লাগল। ডাকিনী বাউরী পিছু হটতে আরম্ভ করলে। হাতের ডাণ্ডা বাগিয়ে ধরলে। কিন্তু আবার মনে হ'ল, না, থাক্। লাগ তখন এগিয়ে চ'লে এসেছে। ডাকিনী বাউরী ডাণ্ডা না তুলে, পরনের কাপড়খানা খুলে, মন্তর প'ড়ে গণ্ডী বন্ধন ক'রে লাগের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে চ'লে এল। বললে, থাক্—থাক্, ওই পর্যন্ত থাক্। কাঁউরের মা-কামিখ্যের হুকুম, বিষহরির দোহাই, ওই হ'ল লক্ষ্মণের গণ্ডীবন্ধনের আঁক। রাম সীতা লক্ষ্মণের দোহাই !

নাগ সত্য সত্যই আর অগ্রসর হতে পারলে না। সে সেই কাপড়খানার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। বারকতক দংশন ক'রে চ'লে গেল ফিরে সেই টিলার উপর।

খানিকটা ছুটে এসে উলঙ্গ ডাকিনী বাউরী ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলে, গাঁয়ের লোক তখন ভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে আরও খানিকটা পিছনে। অবাক হয়ে দেখছে ডাকিনী বাউরীর কাণ্ড—মেয়েছেলে মোড়ল মাতব্বর সবাই। লাগ চ'লে গেল টিলার উপরে, ঢুকে গেল একটা খোয়াইয়ের মধ্যে একটা গর্তে ; ডাকিনী বাউরী হাতের মাটির মুঠোটা দেখতে দেখতে ফিরল, এগিয়ে এল মাতব্বরদের দিকে। উলঙ্গ হয়ে আছে, সে হুঁশও নাই। হুঁশ হয়েও সে কিন্তু লজ্জা পেলে না, লোকেও খুব বিস্মিত হ'ল না। তারা জানে, যে লোক কাঁউরের বিদ্যা জানে তার লজ্জাও নাকি থাকে না।

মেয়েরা শুধু লজ্জায় ছুটে পালাল। আর ছোট ছেলেরা হি-হি ক'রে হাসতে লাগল। মাতব্বরেরা 'আঃ আঃ' করতে লাগল। ডাকিনীর বড় ছেলে নিজের গামছাখানা নিয়ে বাপের কোমরে জড়িয়ে দিলে।

ডাকিনী হেসে বললে, অ! অর্থাৎ এতক্ষণে তার খেয়াল হ'ল যে, সে উলঙ্গ হয়ে রয়েছে।

ছেলে বললে, হাতে কি?

ডাকিনী বললে, মাটি।

মাটি?

ওই কাঁকরের তলায় কি মাটি আছে দেখ্। ওপরটা জ'রে গিয়েছে লাগের বিষে, তলাতে মা-বসুমতীর চেহারা দেখ্। ঘাস কি সাধে হয়েছে অমন!

মোড়লরা এগিয়ে এল। দেখি! দেখি! দেখি! দেখি!

শিবনাথ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল। বলরাম হাত-পা নেড়ে ব'লে যাচ্ছিল। কণ্ঠস্বর তার কখনও গম্ভীর, কখনও হাস্যরসে সরস, কখনও-বা সকরুণ, কখনও-বা তত্ত্বদর্শিতার ঔদাস্যে উদাস, তার অন্তরালে বাজে প্রচ্ছন্ন আক্ষেপের সুর। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বলরাম। তার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল ওই উদাস সুরের অন্তরে আক্ষেপের বেদনা। সামনে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। আকাশ-ভরা নক্ষত্র। সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে বলরাম বললে, লোভ নাকি-নি পাপ। কিন্তু পাপের হাত এড়ানো তো সহজ লয় মাশায়। পাপের তাড়নাতেই পিথিমীর মানুষ ছুটে বেড়ায়, শুয়েও চোখে ঘুম নাই, পেট ভ'রে খেয়েও পেটভরানোর চিন্তা ছাড়া চিন্তা নাই। এই দেখুন না কেনে, বারো বিঘে জমি ভাগে করি, খাই পরি; কিন্তু প্রতি বছর মনে হয়, আর পাঁচ বিঘে জমি ভাগে নিই।

ঘাড় নেড়ে আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলরাম বললে, পাপের ফের আর কি !

শিবনাথ প্রায় মোহগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল গল্পের ঘোরালো রঙের প্রভাবে। স্থূল বলরামের কাহিনী ঢাকের বাদ্যের মত শব্দের উচ্চতার জন্য এ যুগে অচল। তবু শিবনাথের সে গল্প ভাল লাগছিল। সে বললে, তার পর কি হ'ল বল।

বলরাম উদাস কণ্ঠেই বললে, তাই তো বলছি মাশায়। ওই মাটি— এক মুঠো মাটি দেখে গাঁয়ের লোক লোভে সারা হয়ে গেল।

এমন মাটি।

বরমলাগের ওই উঁচু ডাঙাটি প্রায় পঁচিশ বিঘা হবে। সমস্তটার তলায় তো এই মাটি রয়েছে! সাক্ষাৎ লক্ষ্মী রয়েছেন ওই বরমলাগের বিষে জ'রে-যাওয়া কাঁকর-ভরা লাল মাটির ঢিপির তলায়। কিন্তু সেখানে যাবে কে ?

যাবে আর কে ? মানুষই যাবে। আর যাবে কে ? সমুদ্র মন্থন ক'রে নাকি দেবতারা লক্ষ্মীকে উদ্ধার করেছিলেন জলের তলা থেকে। বন জঙ্গল পাহাড় পাথরের তলা থেকে মা-বসুমতীর বুকে লুকিয়ে-থাকা মা-লক্ষ্মীকে উদ্ধার করে মানুষ। 'সীতেরূপিণী' মা-লক্ষ্মী মানুষে উপর অভিমান ক'রে মাটির তলায় চ'লে গিয়েছেন, মানুষকেই তা ফেরাতে হবে যে! তা ছাড়া মানুষের যত লোভ তত সাহস। মানুষ অরণ্য বন নদ নদী পার হয়ে রাক্ষসের পুরী থেকে রাক্ষস মেরে টাকা পয়সা সোনাদানা মণি মুক্তা নিয়ে আসে।

ভূত প্রেত দানা দত্যি কাউকে মানে না মানুষ। চোর বল, ডাকাত বল, ঠ্যাঙাড়ে বল, এদের কারও সামনে কখনও ভূত প্রেত দানা দত্যি কোন কালে কেউ দাঁড়িয়েছে বলতে পার ?

যে দেশে বাঘ আছে, সে দেশে বনের ধারে গ্রামের মাঠ কি পতিত প'ড়ে আছে বলতে পার ?

নদীর ধারে বাস যাদের, তারা প্রতি বৎসরই বানে কষ্ট পায়, ঘর ভাঙে, মানুষ মরে, গরু বাছুর ভেসে যায়, জমিতে বালি পড়ে, মানুষকে কুমীরে ধরে, তবু কি মানুষ ছাড়ে ?

বরমলাগের ঢিপির তলায় যখন এমন মাটির সন্ধান মিলেছে, তখন কি মানুষ ছাড়ে ? ওখানে যাবার মানুষের অভাব হয় ? গেল ডাকিনী বাউরীর বড় ছেলে। বাপের মতই লম্বাচওড়া শাহী জোয়ান, নতুন চাষের নেশায় মেতেছে তখন, তার ওপর বাপের কাছে শিখেছে কাঁউরের বিদ্যা। বছর দুয়েক হ'ল মুনিব-বাড়িতে কৃষাণি ক'রে বাড়িতে দুটি জালা ভর্তি ধান জমিয়েছে। আর এই বছরই ধরেছে সে তিন গণ্ডা তিনটে সাপ। তার মধ্যে পাশের গ্রামের বাবুদের বাড়িতে ধরেছে আড়াই হাত ক'রে দুটো শাহী খরিস। আর মাঠের মধ্যে ধরেছে গোটা সাতেক কালো সাপ। এগুলো ধরেছে খেলা করার জন্য—কোনটা এক হাত, কোনটা দেড় হাত, কোনটা দু হাত। ধ'রে বিষদাঁত ভেঙে, কয়েক দিন খেলা ক'রে কিছু পয়সা চাল রোজকার ক'রে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছে ক্রোশ দুই দূরের নদীর ধারের জঙ্গলে। সেই গেল ওই বরমলাগের ঢিপিতে, সাপকে বধ ক'রে ওই ডাঙা ভেঙে জমি করবে। মনিব মশায়ের সঙ্গে এ নিয়ে গুজগুজ ফিসফিস তার চলছিলই। মুনিব বললেন- তা যদি পারিস তুই, তবে চার বছর তোকে ওই জমি ষোল আনা ভোগ করতে দোব। ডাকিনীর বড় ছেলে বললে—দেখেন মাশায়! মুনিব লক্ষ্মী ছুঁয়ে 'কিরে' অর্থাৎ শপথ করলেন। ডাকিনীর বড় ছেলে বললে—তবে ঠিক আছে সব। আপুনি নিশ্চিন্ত থাক, আমি যাব। শুধু বাবাকে ব'লো না যেন মাশায়।

মনিব বললে, তুইও কাউকে বলিস না। আর সবুর কর্ কয়েক দিন। আগে জায়গাটা বন্দোবস্ত ক'রে নিই জমিদার মশায়ের কাছে।

ঠিক কথা। নইলে ওই মাখনের মত মাটির কথা এখানে কারও জানতে বাকি নাই। শুধু বরমলাগের ভয়ে ও-জমি বন্দোবস্ত নিতে কেউ এগোয় নাই। বরমলাগের ভয় গেলে ওখানকার জমির দর বাড়বে হু-হু ক'রে। ডাকের উপর ডাক চড়বে।

বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

তার পর?—শিবনাথ রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলে। ব্রহ্মনাগকে ধরলে তোমার জেঠা?

উদাস কণ্ঠে বলরাম বললে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু মাশায়। লাগকে ধরার ক্ষ্যামতা কি জেঠার? কতটুকুই বা শিখছিল বিদ্যে! আমার কত্তাবাবা পনরো বছর লালমণির কাছে থেকে শিখে যে লাগকে ভয় খেয়েছে, সেই লাগকে ধরবার এলেম কোথা থেকে পাবে সে? শুধু তার ছিল জোয়ান বয়সের অপার সাহস, আর ওই জমির লোভ, মুনিব বলেছিল—চার বছর ষোল আনা ভোগ করবি, আর পুরুষে-পুরুষে করবি—সেই লোভ। তাতেই গিয়েছিল। বোশেখ মাস, ঝাঁ-ঝাঁ করছে দুপুরে রোদ, খাঁ-খাঁ করছে মাঠ, বাপের সেই সর্পনাশা লতার ডালের লাঠি আর জুড়িবুটি নিয়ে কাউকে কিছু না ব'লে বেরিয়ে গেল। বাড়ির লোকে ভাবলে—যেমন সাধারণ সাপ ধরতে যায়, তাই গেল বুঝি!

তার পর?

তার পর আর কি? বিকেলবেলা খোঁজ হ'ল। কই? কই? কই? বাড়িতে কেউ জানে না। একটা ছেলে বললে, দুপুরবেলায় আমবাগানে আম কুড়াচ্ছিল সে, সে তাকে লাঠি হাতে বরমলাগের ঢিপির দিকে যেতে দেখেছে। তখন ডাকিনী বাউরী উঠে দাঁড়াল। ভীষণ মূর্তি হ'ল তার। চোখ দুটো হয়ে উঠল রাঙা; দাঁতে দাঁতে করতে লাগল কড়কড়, মাথা ঝাঁকি দিতে লাগল, লম্বা চুলগুলো ঝাঁকি খেয়ে হয়ে গেল এলোমেলো।

বন্য বর্বর মানুষ, তার সঙ্গে আদিম বিদ্যার দম্ভের প্রতিহিংসা। ক্রোধে প্রতিহিংসায় ডাকিনীর নিষ্ঠুরতম মূর্তি কল্পনা করলে শিবনাথ; শিউরে উঠলে সে। বলরাম বললে, ডাকিনী হনহন ক'রে চলল মাশায় বরমলাগের টিলার দিকে। যেতে যেতে পথে থমকে দাঁড়াল। মনিবকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি পাঠিয়েছিলে কি না বল।

মনিব বললে, আমি যেতে বলি নাই নটবর। সে নিজে গিয়েছে। সেই আমাকে জোর ক'রে ডাণ্ডা বন্দোবস্ত নিইয়েছে।

ঘাড় নাড়লে কয়েকবার নটবর।

তারপর বললে, আমি মরি আর বাঁচি, লাগকে আমি রাখব না। কিন্তু দেখো, আমার ছোট ছেলে রইল, তাকে তুমি ফাঁকি দিয়ো না।

সে আর দাঁড়াল না মনিবের উত্তর শুনতে। তার ধর্ম তার কাছে। কিন্তু তার বুকের ভিতরটা জ'লে যাচ্ছে। এমন শূরবীর বেটা তার, শুধু বেটাই নয়, সে তার সাকরেদ! তার মনে কত সাধ ছিল, ডাকিনী সে সব জানে; বাপকে সব কথা বলত সে, ঘর করবে, সংসার করবে। ডাকিনী যে এবারেই তার বিয়ে দিয়েছে, ঘরে যে যুবতী বউ। বুকে যে তারও আগুন জলছে।

বরমলাগের মাঠে নতুন-গজানো ঘাসের উপর প'ড়ে ছিল তার ছেলে, সর্বাঙ্গে লেগে রয়েছে সেই নরম ধূলো। বিষের জ্বালায় গড়াগড়ি দিয়েছে। মরবার আগে ওই ধূলো যেন সাধ ক'রে মেখেছে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ডাকিনী বাউরী। কুড়িয়ে নিলে সেই লতার ডাণ্ডা।

গ্রামের ধারে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। যুদ্ধ হবে আজ বরমলাগে আর ডাকিনী বাউরীতে। ডাকিনী হাঁকলে, আয়। দেখি। আমার ছেলেকে খেয়েছিস তু। দেবতাই হোস আর যাই হোস—আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।

টিলার উপর মাথা তুলে দাঁড়াল নাগ।

ঠিক কথা। নইলে ওই মাখনের মত মাটির কথা এখানে কারও জানতে বাকি নাই। শুধু বরমলাগের ভয়ে ও-জমি বন্দোবস্ত নিতে কেউ এগোয় নাই। বরমলাগের ভয় গেলে ওখানকার জমির দর বাড়বে হু-হু ক'রে। ডাকের উপর ডাক চড়বে।

বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

তার পর?—শিবনাথ রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলে। ব্রহ্মনাগকে ধরলে তোমার জেঠা?

উদাস কণ্ঠে বলরাম বললে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু ঘটায়। লাগকে ধরার ক্ষ্যামতা কি জেঠার? কতটুকুই বা শিখছিল বিদ্যে! আমার কত্তাবাবা পনরো বছর লালমণির কাছে থেকে শিখে যে লাগকে ভয় খেয়েছে, সেই লাগকে ধরবার এলেম কোথা থেকে পাবে সে? শুধু তার ছিল জোয়ান বয়সের অপার সাহস, আর ওই জমির লোভ, মুনিব বলেছিল—চার বছর ষোল আনা ভোগ করবি, আর পুরুষে-পুরুষে করবি—সেই লোভ। তাতেই গিয়েছিল। বোশেখ মাস, ঝাঁ-ঝাঁ করছে দুপুরে রোদ, খাঁ-খাঁ করছে মাঠ, বাপের সেই সর্পনাশা লতার ডালের লাঠি আর জুড়িবুটি নিয়ে কাউকে কিছু না ব'লে বেরিয়ে গেল। বাড়ির লোকে ভাবলে—যেমন সাধারণ সাপ ধরতে যায়, তাই গেল বুঝি!

তার পর?

তার পর আর কি? বিকেলবেলা খোঁজ হ'ল। কই? কই? কই? বাড়িতে কেউ জানে না। একটা ছেলে বললে, দুপুরবেলায় আমবাগানে আম কুড়াচ্ছিল সে, সে তাকে লাঠি হাতে বরমলাগের ঢিপির দিকে যেতে দেখেছে। তখন ডাকিনী বাউরী উঠে দাঁড়াল। ভীষণ মূর্তি হ'ল তার। চোখ দুটো হয়ে উঠল রাঙা; দাঁতে দাঁতে করতে লাগল কড়কড়, মাথা ঝাঁকি দিতে লাগল, লম্বা চুলগুলো ঝাঁকি খেয়ে হয়ে গেল এলোমেলো।

বন্য বর্বর মানুষ, তার সঙ্গে আদিম বিদ্যার দম্ভের প্রতিহিংসা। ক্রোধে প্রতিহিংসায় ডাকিনীর নিষ্ঠুরতম মূর্তি কল্পনা করলে শিবনাথ; শিউরে উঠলে সে। বলরাম বললে, ডাকিনী হনহন ক'রে চলল মাশায় বরমলাগের টিলার দিকে। যেতে যেতে পথে থমকে দাঁড়াল। মনিবকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি পাঠিয়েছিলে কি না বল।

মনিব বললে, আমি যেতে বলি নাই নটবর। সে নিজে গিয়েছে। সেই আমাকে জোর ক'রে ডাঙা বন্দোবস্ত নিইয়েছে।

ঘাড় নাড়লে কয়েকবার নটবর।

তারপর বললে, আমি মরি আর বাঁচি, লাগকে আমি রাখব না। কিন্তু দেখো, আমার ছোট ছেলে রইল, তাকে তুমি ফাঁকি দিয়ো না।

সে আর দাঁড়াল না মনিবের উত্তর শুনতে। তার ধর্ম তার কাছে। কিন্তু তার বুকের ভিতরটা জ্ব'লে যাচ্ছে। এমন শূরবীর বেটা তার, শুধু বেটাই নয়, সে তার সাকরেদ! তার মনে কত সাধ ছিল, ডাকিনী সে সব জানে; বাপকে সব কথা বলত সে, ঘর করবে, সংসার করবে। ডাকিনী যে এবারেই তার বিয়ে দিয়েছে, ঘরে যে যুবতী বউ। বুকে যে তারও আগুন জ্বলছে।

বরমলাগের মাঠে নতুন-গজানো ঘাসের উপর প'ড়ে ছিল তার ছেলে, সর্বাঙ্গে লেগে রয়েছে সেই নরম ধূলো। বিষের জ্বালায় গড়াগড়ি দিয়েছে। মরবার আগে ওই ধূলো যেন সাধ ক'রে মেখেছে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ডাকিনী বাউরী। কুড়িয়ে নিলে সেই লতার ডাণ্ডা।

গ্রামের ধারে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। যুদ্ধ হবে আজ বরমলাগে আর ডাকিনী বাউরীতে। ডাকিনী হাঁকলে, আয়। দেখি। আমার ছেলেকে খেয়েছিস তু। দেবতাই হোস আর যাই হোস—আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।

টিলার উপর মাথা তুলে দাঁড়াল নাগ।

হঠাৎ ডাকিনী পিছন ফিরে হাঁকলে ছোট ছেলেকে, ওরে, একটা ছাতা—একটা ছাতা দিয়ে যা। শিগ্রি।

বলরামের বাপ একটা ছাতা নিয়ে ছুটল।

তখন এসে পড়েছে নাগ। নির্ভয়ে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডাকিনী। নাগ মারলে ছোবল, ডাকিনী ডাণ্ডাটা বাড়িয়ে ধ'রে এক পাশে স'রে গেল। নাগের ছোবল লাগল ডাণ্ডায়। ডাকিনী সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে হাঁকড়ালে ডাণ্ডাটা যে, তার ধাক্কায় নাগ উল্টে চিং হয়ে পড়ল।

ঠিক এই সময়ে বলরামের বাপ নিয়ে গেল ছাতা। সে হাঁকলে, বাবা, ছাতা।

ডাকিনী আর চোখ ফেরালে না। বললে, আর এগোস না তু। ছাতা রেখে চ'লে যা।

সঙ্গে সঙ্গে পিছন হঠতে লাগল। নাগও ওদিকে আবার উঠল দ্বিগুণ আক্রোশে। সে কি ভীষণ গর্জন! লকলক করছে জিভ! ঝকঝক করছে কালো মটরের মত দুটো চোখ! দুলতে দুলতে ছুটে এল। ডাকিনী তুলে নিলে ছাতা। ধরলে সামনে ঢালের মত। নাগ ছোবল মারলে, সঙ্গে সঙ্গে ছাতাটি নামিয়ে দিলে ডাকিনী। ভীষণ আক্রোশে ছোবলের পর ছোবল মারতে লাগল সেই ছাতার উপরেই। ডাকিনী বিদ্যুদ্বেগে ছাতার পাশ দিয়ে নাগের পিছনে এসে সেই দণ্ড দিয়ে ধরলে চেপে তার ফণা মাটির সঙ্গে। অন্য হাতে ধরলে তার লেজ। নিষ্ঠুর আক্রোশে সে তাকে টানতে লাগল। মুখটাকে দিলে মাটির ভিতর গুঁজে, রক্তে ভেসে গেল জায়গাটা। তারপর সে ছেড়ে দিলে তাকে। নাগ থ্যাতলানো মাথা নিয়ে ছটফট করতে লাগল।

ডাকিনী মরা ছেলের মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে তাকে বললে, দোষ নাই, তোর দোষ নাই। কিন্তু আমাকে না-ব'লে না-ডেকে এলি কেনে?

শিবনাথ বললে, তার পর ?

বলরাম বললে, তার পর আর কি ? সে চুপ করল।

কাহিনী শেষ ক'রে বলরাম বললে, মাশায়, বরমলাগের মাঠে কখুনও বর্ষায় নোনা লাগে না, আজও এক পয়সার মুনও দিতে হয় নাই। লোকে বলে, ডাকিনী বাউরীর চোখের জলের মুন বরমলাগের মাঠে আজ জ'মে আছে।

বুড়ো বলরাম মনের আনন্দে জোয়ান কালের গান ধ'রে দিলে। নেশার ঘোর, অন্ধকার রাত্রি, নির্জন মাঠ, এর মধ্যে সে কোনমতেই আত্মসম্বরণ করতে পারলে না। গলা ছেড়ে সে গান ধরলে—(আমার) 'পানে'র ঘরে বাঁধবে বাঁসা তোমার মনপাখি, ও আমার 'পানপেয়সী' সখি !

বাবু মহাশয় তাকেই জমিটা ভাগে দিয়েছেন। পাকা 'বাক্য' দিয়েছেন, বলেছেন—বরমলাগের মাঠ আমার ঘরে যতদিন থাকবে বলরাম, ততদিন ও-জমি তুমিই করবে।

বাস্, আর চাই কি ! বরমলাগের মাঠ থেকে নাগকে তাড়াতে গিয়ে তার দংশনে প্রাণ দিয়েছে তার জেঠা, তার কর্তাবাপ ডাকিনী বাউরী নাগকে মেরেছে, তারপর ছোট ছেলে বলরামের বাপকে নিয়ে সেই কাঁকুরে ডাঙার কাঁকর তুলে ফেলে মোলাম মাটি বের ক'রে ভেঙেছে। বছরের পর বছর। ডাকিনী বুড়ো এর পরও বেঁচেছিল ন বছর। এই ন বছর সে ছোটকাকে নিয়ে নাগের মাঠের মাটি কেটে সমান করেছে আর কেঁদেছে। বড় ছেলের জন্যে ডাকিনী বুড়ো কাঁদত আর কাঁদত। শিউরে উঠল বলরাম। ডাকিনী বুড়ো আরও একটা কারণে কাঁদত। তার বাপ তাকে ব'লে গিয়েছে কথাটা। নাগ হলেন দেবতা। নাগের আত্মা ছাড়বেন না, শোধ নেবেন। মাটির ওপরে হঠাৎ কোনদিন সামনে ফণা তুলে দাঁড়াবেন, পরাণের বদলে পরাণ লেবেন। কিন্তু তাতে চাষী

ভয় করে না। মাটি কাটতে গেলেই নাগের সঙ্গে বিবাদ হয়। মাটির তলায় বাস; চাষ করতে গেলেই, নাগের বাস তুলতে হয়। নাগকে বধও করতে হয়। তার বদলে মা-মনসার পূজো দেয় চাষী, ভগবানকে সাক্ষী রাখে। কিন্তু নাগ যদি বুকের মধ্যে বাসা বাঁধে, তবেই হয় সর্বনাশ।

ডাকিনী বাউরীর বুকে নাগ জেগে উঠেছিল। নাগ নিজের মৃত্যুর শোধ নিয়েছিল, ছাড়ে নাই। ডাকিনী বুড়োকে ফাঁসিকাঠে ঝুলে মরতে হয়েছিল। একদিনে ওই বরমলাগের মাঠের জমিকে উপলক্ষ্য ক'রে জোড়া খুন করেছিল ডাকিনী বুড়ো।

সে সব কথা মনে পড়তেই বলরামের আনন্দের গান বন্ধ হয়ে গেল।

গল্প করত তার অর্থাৎ বলরামের বাপ, গল্প করত তার বুড়ী ঠাকুরমা।

বরমলাগের মাঠের জমির নীচের দিকে শেষ সীমানায় ডাকিনী বুড়ো পেতেছিল মাছের আড়া। আজও আছে সে মাছের আড়া। মাঠের মধ্যে এমন মাছের আড়া আর নাই। ভিন গাঁয়ের সীমানা থেকে জলনিকাশি নালা বেয়ে জল নেমে আসে, তার সঙ্গে ভেসে আসে হরেক রকমের ঝাঁক-বন্দি মাছ। সমস্ত মাছ প্রথম আটক পড়ে বরমলাগের মাঠের এই আড়ায়। লহনা পোনা থেকে আরম্ভ ক'রে কই মাগুর পুঁটি—মরা মাছে বোঝাই হয়ে যায় মাছের 'আড়াগাড়ি' অর্থাৎ মাছ আটক করা গোল গর্তটি। জমি ভাঙার সেবার ন বছরের বছর। প্রথম চার বছর জমির ফসল থেকে আরম্ভ ক'রে মাছ পর্যন্ত ষোল আনা পেয়েছিল তারাই। মনিবের সঙ্গে কথামত গতরে খেটে, বাপ-বেটায় বউ-ঝিয়ে খেটে জমি তারাই ভেঙেছিল, জমিদারের খাজনার টাকাও তারাই দিয়েছিল, জমির ষোল আনা ধানও তারাই পেয়েছিল। পরের চার বছর হ'ল আধা ভাগ। ন বছরের বছর মনিব বললে, আর না। অনেক খেলি, অনেক পেলি, এবার ভাগ কৃষাণি—দু ভাগ আর এক ভাগ। বলবার কিছু ছিল না। ডাকিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, তাই হবে। লক্ষ্মীমন্তের

অদৃষ্টে আর লক্ষ্মীছাড়ার অদৃষ্টে পার্থক্য—কথার কথা নয়, বরমলাগ নাগজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ—সে কথাও মিথ্যা নয়; শোনা কথা চোখে আঙুল দিয়ে ভগবান সেবার দেখিয়ে দিলেন বরমলাগের মাঠের ধানের ফসলের মধ্যে। সে কি ধান সেবার! কার্তিক মাস। আউস ধান কেটে, ধান মাড়াই ক'রে ভাগ ক'রে আপনাদের অংশ নিয়ে বাড়ি ফিরে ডাকিনী বুড়ো চোখ রাঙা ক'রে চুপ ক'রে ব'সে রইল দাওয়ার উপর। হঠাৎ দাঁত কিযকিষ ক'রে ব'লে উঠল, আজ মনে পড়ছে লালমণিকে।

বলরামের ঠাকুরমা শিউরে উঠে বলেছিল, লালমণিকে!

হ্যাঁ। লালমণিকে। মাঝে একবার ঘর বেঁধে চাষ করেছিলাম। লালমণি ঘরে আগুন দিয়ে দাঁত কিবকিষ ক'রে বলেছিল, আবার যদি কোন দিন বলবি—ঘর বাঁধব, চাষবাস করব তো আকামা সাপ দিয়ে তোর মাথার তালুতে ডংশাব।

বলতে বলতে উঠে চ'লে গেল সে।

রাত্রে প্রচুর মদ খেয়ে যখন বাড়ি ফিরল, তখন আকাশ ভেঙে জল নেমেছে। চাষীরা দু হাত তুলে নাচছে। কার্তিক মাস, আমনের জমিতে জলের অভাব ঘটেছিল, চারিদিকে হাহাকার উঠেছিল জলের জন্য। সেই জল নেমেছে। ডাকিনী আকাশের মেঘকে অভিসম্পাত দিলে; কেন নামলি, কেন নামলি? শুকিয়ে ম'রে যেত, বেশ হ'ত, কেন নামলি?

ঠিক সেই সময়ে বাড়ি ফিরল মনিব-বাড়ি থেকে বিধবা পুত্রবধূ—লাগ দংশনে প্রাণ দিয়েছে বড় ছেলে, তারই বউ। বউকে ডাকিনী সাঙা করতে দেয় নাই, বাড়িতে রেখেছিল ছেলের আদরে; কাজ করতে দিয়েছিল মনিব-বাড়িতে—ভদ্র চাষীর বাড়ি, ভাল খাবে, ভাল থাকবে; মনিবের বড় ছেলে তাকে ভাল চোখে দেখে, বউটার মনও তার উপর পড়েছিল, সে কথাও অজানা ছিল না, তাতে আপত্তিও করে নাই ডাকিনী বুড়ো; যুবতী বয়স, যাতে তার মন ভাল থাকে তাই সে করুক। মনিবের বেটা,

ভাবীকালে সেই হবে মনিব, সেও খুশি থাকবে গুষ্টিটার উপর। বউকে সে নিজেই চিনিয়ে দিয়েছিল গাছের শিকড়, যাতে বিধবার কলঙ্ক অনায়াসে ঘুচে যায়, মুছে যায়।

বউ বললে, শুনে এলাম ও-পারের গাঁয়ের গড়াঞ্চী পুকুরের মোহনা ভেঙেছে, বড় বড় মাছ বেরিয়ে মাঠে ছয়লাপ হয়ে গিয়েছে।

ডাকিনী অকস্মাৎ আজ বউয়ের চুলের মুঠি ধ'রে তাকে টেনে ফেললে মাটির উপরে আছড়ে ; বললে, কলঙ্কিনী, তুই কলঙ্কিনী।

ফুঁসতে লাগল সে সাপের মতন।

তখন বরমলাগের শাপ ফলেছে, বুকের মধ্যে লাগ জেগেছে। বলরামের বাপ তাকে জাপটে ধ'রে টেনে সরিয়ে এনে বললে, করছ কি তুমি ?

ডাকিনী হঠাৎ আজ বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল মরা ছেলের জন্য।

পরের দিন ভোরে উঠে আড়া ঝাড়তে গিয়ে গর্তের মধ্যে পেলে পাঁচ সের এক রুই। মাছটা তুলে ডাঙায় আছাড় দিয়ে মারছে, এমন সময় ওদিক থেকে গড়াঞ্চী পুকুরের মালিকের লোক ছুটে এসে বললে, আমাদের পুকুরের মাছ।

ডাকিনী বললে, মাছ পড়েছে আড়ায়। মাছের গায়ে পুকুরের নাম লেখা নাই, মাছ আমার।

পুকুরের মালিকের লোক মাছ চেপে ধরলে। ধাক্কা দিয়ে ডাকিনী তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বাড়ি-মুখে পা বাড়ালে।

ওদিকে লোকটা উঠেই এবার আচমকা মারলে এক চড় ডাকিনীর গালে।

ডাকিনীর কোমরে পিঠের দিকে গোঁজা ছিল মাথায়-লোহার-খন্তা-লাগানো সাপ-ধরা ছোট পাঁচন, বিদ্যুদ্বেগে সে খুলে নিলে সেই খন্তা-লাগানো পাঁচন, বসিয়ে দিলে সোজা লোকটার মাথায়। লোহার খন্তাটা

নরম মাটিতে কোদালের ফলার মত খপ ক'রে ব'সে গেল, ফিনকি দিয়ে ছুটল রক্ত, লোকটা প'ড়ে গেল দু হাতে বাতাস আঁকড়ে ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে। ডাকিনী সে দিকে ফিরেও চাইলে না, মাছটা নিয়ে ফিরল বাড়ি। মাছটা বাড়িতে ফেলে দিয়ে বললে, আমি চললাম।

কোথায় ?

কোন উত্তর দিলে না। হনহন ক'রে চ'লে গেল। ফিরল রাত্রে। ডাকিনী চেয়েছিল দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে, কিন্তু পারে নি। সমস্ত দিন লুকিয়ে থেকে ফিরে এসেছে, মাছ দিয়ে চারটি ভাত খাবে। আর ছেলেকে ব'লে যাবে, সাবধান বাবা, বরমলাগের শাপ লেগেছে আমাদের ওপর। সমস্ত দিন চিন্তা ক'রে কথাটা সে উপলব্ধি করেছে, বুঝতে পেরেছে, বুকের ভিতর যে ফুঁসিয়ে উঠছে সে বরমলাগেরই বিষ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ভাত খেতে ব'সে ভাতের থালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

অন্ধকারের মধ্যে তাকে লাগছিল প্রেতের মত।

রাগে ফুলে ফুলে উঠছিল, সাপের গর্জনের মত নিশ্বাসের শব্দ উঠছিল, আর উঠছিল কট কট শব্দ। দাঁতে দাঁতে পিষে নিষ্ফল আক্রোশ প্রকাশ করছিল সে। ভাত খেতে ব'সে, ভাতের থালা ছুঁড়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছে, তার কারণ রুইমাছের খানা নাই। এ যে শুধু পুঁটিমাছ, শুধু পুঁটি। কই রুইমাছ !

ছেলে বললে, মনিবের বড় ছেলে এসে মাছটা উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বলেছে, এটা আমরা নিলাম, তোরা চুনোগুলো সব নিস।

কেউ প্রতিবাদ করতে পারে নি। ও মাছে তাদের রুচিও হয় নি, মাছটার জন্যে ডাকিনী গড়াঞীর লোকটাকে প্রায় খুন ক'রে এসেছে, লোকটা মরে নি, কিন্তু বাঁচে কিনা সন্দেহ। ও মাছ কি তারা মুখে দিতে পারে ?

চীৎকার ক'রে উঠল ডাকিনী, মাছ খাবার জন্যে আমি ফিরে এলাম। মাছ কই, আমার মাছ কই? মাছের জন্যে খুন করেছি, আমার সে মাছ কই?

ডাকিনীর স্ত্রী বললে, দাঁড়াও।

সে বিধবা পুত্রবধূর ঘরে গিয়ে ডাকলে, বউমা!

সঙ্গে সঙ্গে ডাকিনীও দাঁড়াল গিয়ে দরজায়। আগড়ের দরজা। ঘরের মধ্যে বউ বড় মাছের খানা দিয়ে ভাত খেতে বসেছে। সে ভাত নিয়ে আসে মনিব-বাড়ি থেকে। পাতের পাশে মোটা মোটা মাছের কাঁটা প'ড়ে আছে এক রাশি। দেখে ধ্বক ধ্বক ক'রে জ্বলতে লাগল ডাকিনীর চোখ। সে লাফ দিয়ে পড়ল বউয়ের উপর। বুকের উপর চেপে ব'সে দুই হাতে টিপে ধরল তার গলা।

বলরামের বাপ যখন তাঁকে টেনে ছাড়ালে, তখন সব শেষ, হতভাগিনী ম'রে গেছে তখন।

বলরামের বাপ বললে, করলে কি তুমি?

অনেকক্ষণ পর শান্ত হয়ে কপালে হাত দিয়ে ডাকিনী বললে, অদেষ্ট। তারপর বুকে হাত দিয়ে বললে, বরমলাগ জেগে বসেছে বুকে। আমি কি করব?

ব'লে সরাসরি থানায় গিয়ে উঠল, বললে, হাতে পায়ে বেঁধে রাখুন মাশায় আমাকে। আমাতে আর আমি নাই, আমাকে লাগে পেয়ে বসেছে; কি যে কখন করব, তা জানি না।

* * *

হঠাৎ সব চিন্তায় ছেদ প'ড়ে গেল। চমকে উঠল বলরাম, থমকে দাঁড়াল। কি ওটা? আতঙ্কে চীৎকার ক'রে উঠল বলরাম। অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট হ'লেও সে বেশ দেখতে পাচ্ছে, হাত কয়েক দূরে সামনে কি

যেন দাঁড়িয়ে দুলছে। কি ? বেঁকিয়ে ঘাড় তুলে প্রকাণ্ড ফণা মেলে মৃদু মৃদু দুলছে, ওটা কি ? মানুষের সমান মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এত বড় সাপ ! ব্রহ্মনাগ ?

সে চীৎকার ক'রে উঠল, ভয়ার্ত ভাষাহীন চীৎকার, তার সঙ্গে মিশে আছে কোণঠাসা বিড়ালের মত ক্রুদ্ধ গর্জন। থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে। হাতের পাঁচনটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলে। পিছন ফিরে পালাতে ইচ্ছা হ'লেও সাহস হ'ল না। ওর সঙ্গে কে দৌড়ে পারবে ? সাপের সঙ্গে দৌড়ে মানুষ পারে না, দৌড়াতে হ'লে এঁকেবেঁকে দৌড়াতে হয়। কিন্তু এই অন্ধকারে অসমান মাঠের মধ্য দিয়ে সে সম্ভবপর নয়। যুদ্ধোদ্যত হয়েই সে দাঁড়িয়ে রইল, আয় আয় আয়। বলরাম মরবেই, কিন্তু তোকে না নিয়ে সে যাবে না।

সেটা কিন্তু এগিয়ে এল না। সেইখানে দাঁড়িয়েই মৃদু মৃদু দুলতে লাগল। বলরামের সন্দেহ হ'ল এবার। এক এক পা এগিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে লাগল। হঠাৎ সে চীৎকার ক'রে হেসে উঠল। সাপ নয়, শুকনো তালপাতার বাঁকা গোড়ার দিকটা, মাটির উপর প'ড়ে আছে, বাতাসে অল্প অল্প নড়ছে।

জয় ভগবান, জয় মা-মনসা !

মনে পড়ল বাপের কথা। বাবা ব'লে গিয়েছেন—বলরাম, মা-মনসার পূজো দিস, নাগপঞ্চমীর দিন মাটি খুঁড়িস না, লাঙল ধরিস না, উনোন জ্বালিস না, গরম খাস না ; বরমনাগ কোনদিন ছামু ছানু দাঁড়াবে না, অনিষ্ট করবে না। তবে বাবা সাবধান, বুকের মধ্যে উনি জাগবেন। আমার দাদার জেগেছিল, বাবার জেগেছিল, সে কথা তু জানিস ; কিন্তু আমার কথা জানিস না, আমারও জেগেছিল রে। কেউ জানে না, তোকে ব'লে যাই, শেষ বয়সে তোকে না ব'লে শান্তি পাব না।

মনিবের ঘরে ডাকাতির কথা মনে পড়ে ?

পড়ে বইকি! বলরামের বয়স তখন আঠারো-উনিশ, ভরা জোয়ান। বাপের সঙ্গে সে তখন চাষ করছে, বরমলাগের মাঠে সেই তখন লাঙলের মুঠো ধ'রে মাটি চষে। বরমলাগের মাঠের ফসলে তখন মনিববাড়িতে সারি সারি ধানের গোলা উঠেছে। লোকে বলত, বরমলাগের শাপ নিয়ে ডাকিনী বাউরী ফাঁসি গেল, লক্ষ্মীর দয়া পড়ল মনিবের উপর। যে লক্ষ্মীকে আগলে রেখেছিল বরমলাগ, সেই লক্ষ্মী পায়ে হেঁটে এসে ঢুকলেন জমির মালিকের ঘরে।

অন্ধকার মেঘলা রাত্রি। শ্রাবণ মাস। ঝিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ দুমদুম শব্দ উঠতে লাগল, তারপর চীৎকার উঠল। মেয়েছেলের কান্নায় রাত্রির অন্ধকার যেন ফেটে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। তার সঙ্গে উঠল রে-রে-রৈ চীৎকার।

বলরাম লাফ দিয়ে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল উঠানে। ডাকলে, বাবা!

বাবারও ঘুম ভেঙেছিল, ঘরের ভেতর থেকেই সাড়া দিলে, বললে, হ্যাঁ।

শুনছ?

শুনেছি। ডাকাত পড়েছে। বার হ'স না, শুয়ে পড়্ গা।

শুয়ে পড়ব? বেরুব না? কার বাড়িতে দেখব না?

না। ধমক দিয়ে উঠেছিল বাবা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে নিজেই উঠে এসে বলরামকে ডেকেছিল, ওঠ্। চল্, দেখি, নইলে হয়তো দোষ পেতে হবে।

দোষ সত্যিসত্যিই ছিল। দোষ নয়, বরমলাগের বিষ। মনিবের ঘরের বাড়বাড়ন্ত দেখে বলরামের বাবা ডাকাতের দলের সঙ্গে যোগসাজস করেছিল। কোথায় কি থাকে, কোন্ ঘরের কোন্ দরজা, কে কোন্ ঘরে শোয়, কার কোমরে চাবি, মায় কদিন আগে বারো শো টাকার ধান বিক্রি ক'রে আসার খবর পর্যন্ত সে দিয়েছিল তাদের। কোন্ দিকে কোন্খানে ঘাঁটি পাততে হবে, ঠিক ঠিক জানিয়ে দিয়েছিল। তার বেশি কিছু না।

বলরামের বাপ শেষ-বয়সে সে দিন তাকে বলেছিল—ওরে বাবা, দু ভাগ ধান মনিব নিয়েছে, এক ভাগ ধান সুদ-সয়দা কেটে দিয়ে শুধু-হাতে ঘর ঢুকেছি, কোনদিন তো এমন ইচ্ছে হয় নাই, এমন কাজ করি নাই! সেবার দিয়েছিলাম জমিতে অল্প চারটি সোনামুগ। সোনামুগ ফলে কি না দেখবার তরে দিয়েছিলাম। হয়েছিল। মোটমাট সাত সের সোনামুগ হ'ল। মনিব বললে, ও কটা আর তু পাবি না। ও আমি নিলাম। বললাম, সের খানেক দেন আমাকে। মনিব বললে, এক ছটাক আমি দোব না। ওর বদলে মস্থরি নিস তুই। সেই হ'ল কাল। মনে হ'ল, বলরাম, মনে হ'ল, মনিবকে খুন ক'রে দি। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠে ভয়ে পালিয়ে এলাম বাড়ি। সারা দিনটা আপন মনে গর্জালাম, তোর মায়ের ওপর, তোর ওপর, বউমার ওপর, বেহ্মাণ্ডের ওপর। তোর মা বলেছিল, সাপের মতন গর্জে গর্জে বেড়াইছে দেখ! সাপই বটে রে, সাপই বটে। তারপরে আর তাকে থামাতে পারলাম না। জষ্টি মাসে আবার মনিব করলে এক কাণ্ড। তরমুজের থানা দিয়েছিলাম। গাছ হ'ল, কিন্তু সব গাছ ম'রে গিয়ে থাকল শুধু একটি লতা। চার-পাঁচটি তরমুজ ধরেছিল। প্রথম তরমুজটি আমি চুরি ক'রে খেয়েছিলাম। মনিব আমাকেই সন্দ করেছিল। সন্দ ক'রে বললে, তোমার ভাগ ওই ওতেই গেল। ওটাই ছিল সব চেয়ে বড়। বাকি কটা আমি নিলাম। ব'লে সব কটা তুলে নিলে। পাকেও নাই সব কটা ভাল ক'রে, তবু তুলে নিলে। এবার আর রাগ মানলে না, বরমনাগের বিষ মনের মধ্যে সাত কলসী হয়ে ফেঁপে ফুলে উঠল। যোগসাজস করলাম ডাকাতের দলের সঙ্গে। ওরাও ঘরসন্ধানী লোক খুঁজছিল। আমি দিলাম খোঁজ। কুড়ি টাকা ওরা আমাকে দিয়েছিল, কিন্তু তার চেয়ে সুখ হয়েছিল—আমার মনিবের দুর্দশায় আর মনিব-বাড়ি 'ভাঙটা' পড়ায়। পাপ—পাপ—তা জানি, তবু মন মানে নাই। ওই মনিবই তো মাছটা নিয়েছিল, যে মাছের জন্যে বাবা ফাঁসি গিয়েছিল; ওই

মনিবই যে আমার ভাজবউকে নষ্ট করেছিল; ওই তো নিয়েছে আমার ভাগের মুগ; ওই নিলে কাঁচা তরমুজগুলা তুলে। জলন্ত মশালের বাড়ি মেরে বুড়োর পিঠ বুক সব ছিঁচকে-পোড়া ক'রে দিয়েছিল, তাতেই আমার সুখ হয়েছিল বেশি। কিন্তু আজ—আর কাল ফুরিয়ে এল বাবা, ভাবছি, পারে গিয়ে কি জবাব দোব?

উদাস হয়ে অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলরামের বাপ বলেছিল, বলব, আমি নিজে করি নাই ধরমদেব, বরমলাগের শাপ আমাকে করিয়েছে। কিন্তু সে কি শুনবে?

ধরমদেব পরকালে এ কথা শোনেন কি না কে জানে! কিন্তু বলরাম জানে, বুকের মধ্যে বরমলাগের শাপ কোন কথাই শোনে না, কোন পাপের ভয়কেই সে মানে না। বুকের মধ্যে ধিক-ধিক ক'রে তুষের আগুনের মত জলছেই সে—জলছেই। স্পষ্ট বুঝতে পারে সে। মাথার মণির মত মনিব মহাশয়কে দেখে তার মধ্যে মধ্যে বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে ওঠে। মনিব বাড়ির অকল্যাণে যখন মনটা টনটন করতে থাকে, চোখ দিয়ে সত্যি সত্যিই জল পড়ে, তখন হঠাৎ মনের ভিতর থেকে এক সময় ওই আগুনটা দপ ক'রে জলে ওঠে; মন ব'লে ওঠে—বেশ হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে! শিউরে উঠে সঙ্গে সঙ্গে সে ব'লে ওঠে, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

মনিব-বাড়িতে ধানের ভাগ দিয়ে মনিবের গোলা ভর্তি ক'রে দিয়ে নেমে এসে যখন খুশি হয়ে বলে, আসছে বারে আবার নতুন গোলা করতে হবে মাশায়, তখনই সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে আঁধার রাত্রে রাঙাবরণ আগুনের শিখা জ্ব'লে ওঠার ছবি। পটপট শব্দে ধান পুড়ে খই হওয়ার শব্দ সে যেন কানে শুনতে পায়।

সে চঞ্চল হয়ে উঠে ঘসঘস ক'রে সর্বাঙ্গ চুলকাতে থাকে, অস্থির হয়ে ওঠে। মনিব বলেন, কি রে? ধানের ধুলোয় শরীর সুড়সুড় করছে বুঝি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—ব'লে সে দ্রুত চ'লে গিয়ে পুকুরের জলে নেমে পড়ে, ডুব দিতে থাকে—দুটো চারটে দশটা। তারপর 'হরিবোল, হরিবোল' বলতে বলতে উঠে আসে শান্ত সুস্থ হাসিমুখে।

যে দিন স্নান ক'রেও মন শান্ত না হয়, সে দিন অধীর হয়ে বাড়ি ফিরে প্রচুর পরিমাণে মদ খায়, স্ত্রীকন্যাকে প্রহার করে। তারপর নেশার ঝোঁকে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে উঠে শান্ত সুস্থ হয়ে সে হরিকে ডাকে। তারপর খুঁজে খুঁজে কোন একটি দুর্লভ ফল, শশা কিংবা পেঁপে কিংবা চালকুমড়ো কি লাউ, তার সঙ্গে এক ঘটি দুধ নিয়ে মনিব-বাড়িতে হাজির হয়। অকৃত্রিম প্রীতি ও ভক্তির সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে হাসতে থাকে।

মধ্যে মধ্যে কাজকর্মের বরাতে ঘরের মধ্যে ঢুকে ঘরের কোণে কাঠের র‍্যাকে ঠেসানো শিবনাথের উইন্‌চেস্টার রিপিটারটার দিকে শঙ্কাতুর বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে দেখে, ঘরে লোকজন না থাকলে বন্দুকটার নলে হাত দিয়ে তার অদ্ভুত শীতল কঠিন স্পর্শ অনুভব করে।

পুরানো মনিব মণ্ডল মহাশয়দের বাড়িতে ছিল দুখানা বগি-দা।

বন্দুকটার গায়ে হাত দিয়ে বলরাম হঠাৎ হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলে, শালো!

কিন্তু বরমলাগের অভিশাপের বিষ যে দিন পাথার হয়ে উথলে ওঠে, সে দিন ও-ভয়ও থাকে না। জলন্ত মশাল হাতে নিয়ে দলের সামনে বলরাম নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে একটা বন্য চীৎকার ক'রে উঠল,—পশুর মত চীৎকার। নাকের মধ্য দিয়ে যে নিশ্বাস পড়ছে, সে আগুন। চোখ দুটো লাল কুঁচ। ওরা ধান লুঠ করতে এসেছে।

শিবনাথ তার রিপিটারে ছয়টা কার্টিজ পুরে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সকলের সম্মুখে বলরামকে মশাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল। বলরাম! বলরাম দাঁড়িয়েছে সকলের আগে!

১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার জন্য সপরিবারে শিবনাথ দেশে এসে বাস করছে। দেশে এসেও শান্তি নাই। চাষী কৃষাণদের মধ্যে ঢেউ উঠেছে—তেভাগা। এতদিন মনিবে পেয়েছে দু ভাগ, এবার তারা দাবি করছে দু ভাগ।

বলরাম শিবনাথের কাছে এসে পায়ের কাছে সঙ্কিত বিবর্ণ মুখে বলেছিল, বাবু মাশায়, আমাকে বাঁচান।

কি? ব্যাপার কি?

বলরাম কম্পিত কণ্ঠে বলেছিল, ওরা বলছে, দু ভাগ নইলে চাষ করব না।

হেসে শিবনাথ বলেছিল, তার আমি কি করব? আমার কাছে তুমি কি দু ভাগ দাবি করছ?

আজ্ঞে?—উত্তরে বিহ্বলের মত প্রশ্নই করেছিল বলরাম।

আমার কাছে কি দু ভাগ চাচ্ছ তুমি?

একটু চুপ ক'রে থেকে বলরাম বলেছিল, আমি বলেছি মাশায়, দশবার বলেছি—অন্যায়, আমরা দু ভাগ নিলে বাবুদের চলবে কি ক'রে? তা ছাড়া টাকা দিয়ে জমি কিনেছে জমির মালিক, তার এক ভাগ, কোন্ আইনে হবে? ধরমে সইবে কেন? তা কিছুতে শুনবে না ওরা।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ভেবে শিবনাথ বলেছিল, দু ভাগ যদি দেশচলিত পাওনা হয় বলরাম, আমি তাই দোব তোমাকে। তাতে আমি আপত্তি করব না। যদি নাও হয়, তবু ভাগ এবার তোমায় বাড়িয়ে দোব। দোব নয়, দিলাম। আঠারো বাইশে ভাগের—তোমার বাইশ, আমার আঠারো। কেমন?

ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলেছিল বলরাম। পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে ফিরে গিয়েছিল। আজ সকালে নিজেই এসে সংবাদ দিয়ে গেছে, ব্যাপার খারাপ বাবু মাশায়। ধান লুঠ করবার জটলা হচ্ছে। কিছুতেই মানবে না।

সেই বলরাম এসে দাঁড়িয়েছে দলের পুরোভাগে, এবং সর্বাগ্রে এসেছে তারই বাড়িতে লুঠ করতে !

শিবনাথ বন্দুকটা তুলে ধরলে।

হাসপাতালে শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলে, কেন, কেন, এমন করলে বলরাম ? আমি তো তোমাকে বেশিই দিতে চেয়েছিলাম।

উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বলরাম। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, বরমলাগ !

দু ফোঁটা জল দু চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল।

কলিকাতার দাঙ্গা ও আমি

কাল, যে কাল অতীত হয়ে গিয়েছে শতাব্দী—বহু শতাব্দী—বহু—বহু—বহু শতাব্দী পূর্বে, সে কি অকস্মাৎ মহাকালের সম্মুখের গতিপথ রুদ্ধ ক'রে ফিরে এসে দাঁড়ায়? উমা এবং শঙ্করের শান্ত-স্নিগ্ধ সংসার-জীবনের কোন সন্ধ্যায় মঙ্গল-প্রদীপটি নিবিয়ে দিয়ে দক্ষযজ্ঞের তামস রাত্রি কি অট্টহাসি হেসে প্রকট হয়ে ওঠে স্বল্পক্ষণের জন্য? সুন্দরবনের প্রত্যন্ত-সীমায় তিন শো বৎসর পূর্বে যে আরণ্য দিন-রাত্রি বিগত হয়ে গিয়েছে, সেই দিন-রাত্রি বিংশ শতাব্দীর ছেচল্লিশ বৎসরের আগস্ট মাসে সভ্যতা-সংস্কৃতি-সাধনার গতিপথ রুদ্ধ ক'রে অকস্মাৎ ফিরে এল কি ক'রে?

কালো কলকাতা—রক্তাক্ত কলকাতা—নারকীয় কলকাতা—কোনও নামে অভিহিত ক'রে মন শান্ত হচ্ছে না; কথার কারবারীর পুঁজি ফুরিয়ে গিয়েছে, উপযুক্ত নাম—এই দিন-রাত্রিগুলিকে চিহ্নিত করবার মত নাম খুঁজে পাচ্ছি না।

কলকাতার আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে গিয়েছিল—পেট্রোলের সাহায্যে পাকা বাড়ি পুড়ে গেল; পণ্যসম্ভার-ভরা দোকান লুঠ হয়ে গেল, কাঠ-কাঠরা আসবাব আগুনে ছাই হয়ে গেল—সাদা বা ধূসর ছাই নয়, কালো অঙ্গারের স্তূপ, মূল্যবান কাঠের দগ্ধাবশেষ। আর্ত নরনারীর মর্মন্তুদ চীৎকারে আর্ত হয়ে উঠল কলকাতার বায়ুস্তর—অনন্ত কালের ইথার-তরঙ্গে একটি অনুচ্ছেদ রচনা ক'রে রাখলে। তার পটভূমিতে থাকল মানুষেরই পশুরূপের হিংস্র পৈশাচিক গর্জন। সুন্দরবনে বাঘে মানুষ ধরলে অথবা হরিণ ধরলে যে বিপরীতধর্মী দুটি শব্দ সংমিশ্রণ হ'ত, তারই প্রতিধ্বনি

উঠল যেন। রক্তে মাটি ভেসে গেল, পোড়া ছাই সে রক্ত শুষে নিলে। মায়ের কোল থেকে ছেলে ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিলে আকাশস্পর্শী অট্টালিকার ছাদ থেকে—পাথরে বাঁধানো রাজপথে। নারীকে ধর্ষণ ক'রে ধারালো অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড ক'রে কাটা হ'ল। অসহায় শান্তিপ্রিয় গৃহস্থকে হত্যা করলে। লাঠির আঘাতে কুকুরের মত মারলে নিরীহ গরিবের দলকে। বস্তিতে আগুন জ্বলছে, চারি দিকে হিংস্র মানুষ উল্লাস করছে, তারই মধ্যে ঘরের ভিতর থেকে অসহ্য তাপে আর্ত মানুষ বেরিয়ে এল, পালাবার জন্য পাগল হয়ে লাফিয়ে উঠল চালের উপর, চারি দিকের মানুষকে সে করজোড়ে বশ্যতা জানালে, প্রাণভিক্ষা চাইলে, তার বদলে চারিদিক থেকে নিক্ষিপ্ত হ'ল ইট। ইট মাথায় লেগে চেতনা হারিয়ে হতভাগ্য পড়ল অগ্নিকুণ্ডে। ছাই এবং রক্ত মিশে কালো আবরণে ঢেকে দিলে মহানগরীর পরিচ্ছন্ন এবং দু পাশের বিপণিশ্রেণীর পণ্যসম্ভার ও আলোকচ্ছটায় প্রতিফলিত রাজপথ। অল-ইণ্ডিয়া-রেডিওতে রেকর্ডের মধ্যে বাজছিল এক দিকে রবীন্দ্রনাথের গান —"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী—নিত্যনিঠুর দ্বন্দ্ব"। সে গানকে ঢেকে দিয়ে, চেপে দিয়ে, মুছে দিয়ে, মহানগরীর পথে পথে জেগে উঠল শ্মশানের কোলাহল, আকাশ থেকে শবমাংসলিপ্সু শকুনের দল নেমে এল—পাখা ঝাপটে লোভার্ত তীক্ষ্ণ চীৎকার ক'রে। কাকেরা কোলাহল ক'রে ছুটে এল, পথচারী কুকুর শবমাংসের মত্ততায় উগ্র গর্জন শুরু করলে, দূর-দূরান্তর থেকে তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি দিয়ে দিক্-নির্ণয় ক'রে রাত্রে এসে শেয়ালেরা আনন্দ-ধ্বনি তুললে। কয়লা-পেট্রোলের ধোঁয়ার গন্ধে ভারী মহানগরীর আকাশ গলিত শবের গন্ধে নিষিক্ত ছাইয়ের কণায় আকীর্ণ হয়ে উঠল। মাছি উড়তে লাগল; আবর্জনাস্তূপে শবদেহের প্রাচুর্য কৃমিকীট ছড়াতে লাগল—সুন্দরবনের অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে তলদেশের অগণ্য বিষাক্ত পতঙ্গ-কীটের মত। মহানগরীর রাজপথের পার্কে বর্ষা ঋতুর ফুলগুলি অবশ্যই ফুটল যথানিয়মে, কিন্তু তারাও সে কদিন ফুটল—সুন্দরবনের অন্ধকার অরণ্যের

ফুলের মত। ভাগ্যবিচার করলে এদের ভাগ্য বনের ফুলের চেয়েও অনেক হীন। বনে যে সব ফুল ফোটে তাদের গন্ধ হারায় না। এ কয়েক দিনের মহানগরীতে যে সব ফুল ফুটল, তাদের গন্ধ গলিত শব ও আবর্জনার গন্ধের মধ্যে হারিয়ে গেল, সম্ভবত ভ্রমর কি মৌমাছিরা আসে নাই; ফুল হতে বীজ হওয়ার সৃষ্টি-লীলাও বোধ করি এ কয়েক দিন ব্যাহত হয়েছে।

তাই প্রশ্ন জাগল মনে—মহাকালের সম্মুখের গতিপথে অতীত কালের প্রেত কি গলিত শবমূর্তিতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়ে বললে, যে রূপকে তুমি নির্মোক ব'লে, খোলস ব'লে ফেলে এসেছ, সেই আমি—আমি মরি নাই?

মনের অবস্থা এমনই। এই ভাবনাই ভাবছিলাম। এই বীভৎসতার মধ্যে, বর্বরতার মধ্যে কার অপরাধ বেশি—হিন্দু কি মুসলমানের, তার বিচার করি নাই; কার ক্ষতি বেশি, কার কম, সে খতিয়ান ক'ষেও দেখতে চাই নাই। নানা গবেষণা কানে এসেছে।—ফেব্রুয়ারি-নভেম্বরে হিন্দু-মুসলিমের মিলিত সংগ্রামোদ্যমের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল বুলেটের সামনে বুক পেতে দেওয়ার বীর্যের মধ্যে, মিলিটারী লরি পোড়ানোর উন্মত্ততার মধ্যে, সেই সম্ভাবনাকে উত্তরার গর্ভে পাণ্ডব-বংশের ভ্রূণকে হত্যার জন্য অশ্বত্থামার গুপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের মত তৃতীয় পক্ষের এটা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ। কতিপয় স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকের আপনার সম্প্রদায়, সমাজ এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যে আসন কায়েমী করবার জন্য এটা একটা সামন্ততান্ত্রিক নীতি। দলের অনুচরবৃন্দকে যুদ্ধ-তৃষা ক্ষান্ত করতে দেওয়ার একটা ক্ষেত্র সৃষ্টি। এ পক্ষের সংহত শক্তিকে উত্তেজিত ক'রে বিশৃঙ্খল এবং বিভ্রান্ত করার জন্য শব্দভেদী গুপ্ত বাণের মত এটা একটা কুটিল অস্ত্রনিক্ষেপের ফল। কানে এসেছে অনেক। কিন্তু সে নিয়ে গবেষণা করি নাই, ভাবনা করবার মত মনের বুদ্ধি-শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। গোপনে চোখের জল ফেলে, আবেগপ্রবণতার মুখে ভাবছিলাম শুধু,

বিংশ শতাব্দীর মানুষের মধ্যে সুন্দরবনের প্রেতলোকের আবির্ভাব হ'ল কি ক'রে?

প্রণাম শুধু একটি মানুষকে। কলকাতার আরণ্য দিন-রাত্রির প্রেতক্ষণ সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ছে, বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য-সঙ্গীত সকল সংস্কৃতি-প্রভা নিষ্প্রভ হয়ে প্রেততমসার আবির্ভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এ সময় একটি দীপশিখা জ্বলছে—অকম্পিত দীপশিখা। একটি অভ্রান্ত কণ্ঠ জাগ্রত রয়েছে। পড়লাম তাঁর বাণী—মনে হ'ল, উত্তাপহীন ধূমহীন অক্ষয় অগ্নির অক্ষরে লেখা; কল্পনায় শুনলাম—মনে হ'ল, আবেগহীন এবং দধীচির অস্থির মত শুভ্র, সেই অস্থিদণ্ডের আঘাতোত্থিত ধ্বনির মত সে কণ্ঠস্বর।—"মরিবই—এই সাহস লইয়া হিন্দুদের শেষ মানুষটি পর্যন্ত যদি মরিত, তাহা হইলে মৃত্যুর পথ দিয়া হিন্দুধর্ম মুক্তিলাভ করিত এবং ইসলাম এই দেশে পরিশুদ্ধ হইয়া উঠিত।" বাংলা দেশের নগণ্য লেখকের মনে এই বাণী বাঙালীর প্রতি মমতায় খানিকটা পরিবর্তিত হয়ে প্রতিধ্বনি তুললে—বিগত শতাব্দীর হিন্দু-মুসলমানের সাধনায় গড়া বাংলার সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির মমতাচ্ছন্ন মন ব'লেই হয়তো এমন হ'ল। প্রতিধ্বনিত হ'ল—"মরিবই—এই সাহস লইয়া এক দল শিক্ষিত বাঙালী-হিন্দু-মুসলমানের মিলিত একটি দলের শেষ মানুষটি যদি মরিত, তাহা হইলে মৃত্যুর পথ দিয়া হিন্দুত্ব এবং ইসলাম পরিশুদ্ধ হইয়া উঠিত। মর্ত্যে স্বর্গ সৃষ্টি হইতে পারিত।"

পারি নাই আমরা। সেই লজ্জায় আজ সর্বপ্রথম অনুভব করলাম—লজ্জার মধ্যে আছে মর্মান্তিক দুঃখ, গভীরতম বেদনা।

এই বেদনাহত অন্তর নিয়ে কলকাতায় আর থাকতে পারলাম না। পরিবারবর্গ আগেই দেশে গিয়েছে, আমিও দেশে রওনা হলাম।

শুষ্কমুখ, ভয়চকিতদৃষ্টি নর-নারী-শিশু। কত জন কাঁদছে, কারও

গিয়েছে সর্বস্ব। সকলেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দরিদ্রের একমাত্র আশ্রয় ভগবানকে ডাকছে। মধ্যবিত্তের মুখে-চোখে সুস্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ, তারই সঙ্গে রয়েছে আত্মপ্রতারণার মেকি উত্তেজনা, জিহ্বায় বিষাক্ত বাক্‌চাতুরী। ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসেও ভিড় রয়েছে, ধনীরাও চলেছেন; আতঙ্ক তাঁদের মধ্যেও সুস্পষ্ট, কিন্তু মুখে রয়েছে গাম্ভীর্যের মুখোশ। ভগ্ন কণ্ঠস্বরে প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা করছেন, অভিশাপ দিচ্ছেন অনাচার-অত্যাচারকে। নানা গবেষণা চলছে। বুকের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ব'য়ে নিয়ে চলেছে এই প্রেতক্ষণের অন্ধকার—দেশ-দেশান্তরে ছড়াতে চলেছেন। গুপ্তভাবে ঘাতকও চলেছে কত জন।

একটা ইণ্টার ক্লাসে ঢুকে বসলাম। এদের সঙ্গে আমার কোন প্রভেদ নাই। এরাও কাপুরুষ। আমি বেশি কাপুরুষ, কারণ ওদের জীবনে সাধনার ঘোষণা নাই, আড়ম্বর নাই। আমার ছিল; সুতরাং আমার পরাজয়ের লজ্জা অনেক বেশি। মাথা নীচু ক'রে বসলাম। চোখের সামনে খুলে বসলাম—প্রাচীন বাংলার ইতিহাস একখানা। আত্ম-প্রতারণার পথ খুঁজছিলাম বোধ হয় সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তির চমৎকারিত্বের পথে—প্রাচীন ইতিহাসের তথ্যের গবেষণা ক'রে তারই ভিত্তির উপর একালের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক দর্শনশাস্ত্রের পটভূমিতে দুটি সম্প্রদায়কে খাড়া ক'রে বিস্ময়কর একটা তথ্য আবিষ্কার ক'রে তারই গৌরবে কর্তব্যচ্যুতির পরাজয়ে লজ্জা না ঢেকে বাঁচবারই বা পথ ছিল কোথায়?

গাড়ি ছাড়বার মুখে হঠাৎ মেয়েছেলে নিয়ে এসে উঠলেন একটি ভদ্রলোক।

একটু—একটু জায়গা দিন সার্। বড় বিপদ থেকে কোন রকমে বেঁচে এসেছি।

আসুন—আসুন। আসুন।

উঠলেন ভদ্রলোক। আমি কিন্তু বিস্মিত হলাম। আমি চিনি—

আমার দেশের লোক। হাফিজ আমার দেশের লোক। কলকাতায় কর্পোরেশনে কাজ করে, ভালই মাইনে পায়। আমি বিস্মিত হলাম হাফিজের স্ত্রীর মাথায় বোরখা নাই দেখে; সিঁথিতে সিঁদুর রয়েছে ব'লে মনে হ'ল; সে অবশ্য আমার ভ্রম হতে পারে। হাফিজের পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি; দাড়ি সে কখনই রাখে না; গোঁফও কামিয়েছে—আজই কামিয়েছে মনে হ'ল। এই ত্রস্ত পলায়নের উদ্যোগ-পর্বে কামানোটা সভ্যতা বজায় রাখার অঙ্গ ব'লে মনে করতে খটকা বাধল।

গাড়ি চলেছে—লুপ লাইনে, হাওড়ার পর হুগলী, তার পর বর্ধমান, তার পর বীরভূম। হিন্দু-যাত্রীতে গাড়ি বোঝাই। একজন ভদ্রলোক মেয়েছেলে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি নিজে উঠে আপনার বাড়ির মেয়েদের পাশে জায়গা ক'রে দিয়ে বললেন, ব'স মা, ব'স।

হঠাৎ হাফিজ মুখ ফিরিয়ে এবার আমাকে দেখতে পেলে। আমার দৃষ্টিবিভ্রম কি না জানি না—মনে হ'ল, হাফিজের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল; মুহূর্তের জন্য দেখতে পেলাম তার মুখ, পরমুহূর্তেই সে মুখ ফিরিয়ে নিলে। আমিও মুখ ফিরিয়ে নিলাম। বুঝতে পারলাম তার আশঙ্কার হেতু। বইয়ে মন দিতে চেষ্টা করলাম। অন্য সময় হ'লে হাফিজ পাশে এসে জেঁকে বসত, গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে হিন্দু-মুসলিম-সমস্যা নিয়ে প্রবল তর্ক জুড়ে দিত আমার সঙ্গে। সত্যের প্রতি হাফিজের শ্রদ্ধা আছে। সে তার বংশ-পরিচয়ের চিত্র আঁকতে গিয়ে ইরান-তুরানকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করে না। সে বলে, এই দেশেরই মানুষ ছিলেন তা৹ পূর্বপুরুষ। হেসে বলে, দাদা, কান্যকুব্জ থেকে যদি আপনার পূর্বপুরুষ এসে থাকেন, তবে বাংলা দেশে বিদেশী আপনি। আমার দাবি তা হ'লে আপনার চেয়ে অনেক বেশি। অনেক তথ্য সে আওড়ায়। এর মধ্যে পাকিস্তানের দাবি তার যত প্রবল, তার চেয়ে বেশি প্রবল সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের গভীরতার দাবি। তার সে দাবি আমি সস্নেহে মেনে নিয়ে থাকি। মেনে

নিয়েও দু-একবার প্রশ্ন করেছি, সেই দাবির বলে কি বাংলা দেশে আরবী-ফারসী চালাতে চাও? অন্তত পক্ষে পাঞ্জাবি, উর্দু, কি পস্তু?

হাফিজ নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে, নেভা—। অর্থাৎ 'নেভার'—শেষের 'র'কারটা বাদ দিয়ে উচ্চারণটা খাঁটি অক্সফোর্ডী বা খাস বিলাতের অন্য কোন স্থানীয় ক'রে তুলতে চায়—আজকালকার হিন্দু-মুসলমান-বিদগ্ধদলীয় সুসভ্যের মত। তার পর সে বাংলার ভাবী সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেয়। তার মধ্যে ভাল ভাল কথা অনেক থাকে। দু-একবার কানে কানেও বলেছে, দাঁড়ান না, কয়েকটা বছর সবুর করুন। বাংলার লীগ থেকে উর্দুভাষী আমিরী লিডারশিপ মুছে দোব। যারা জবান খারাপ হবে ব'লে ছেলেদের লক্ষ্ণৌ-লাহোরী তালিম নিতে পাঠায়, বিলেতে ঘুরে কুত্তা পোষে, সাহেবী হোটেলে খানাপিনা করে, খানদানী ঘরের গুমরে বাংলার মুসলমানকে দেখে মুখ বাঁকায়, শুধু ভোটের সময় ইসলামের দোহাই পেড়ে মুসলমান সমাজের খিদমদগার সাজে, তাদের আমরা সরিয়ে দোব। তখন দেখবেন, তখন বুঝবেন।

ব্যাপারটার সঙ্গে আমাদের বর্ণাশ্রমধর্মের উঁচু-নীচু পৈঠে ভেঙে এক বেদীতে দাঁড়িয়ে নূতন হিন্দুসমাজ সংগঠনের যথেষ্ট মিল আছে। বামমার্গীদের ধনী ও নির্ধনের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের পরিণতিতে ধনীর অস্তিত্ব এবং আধিপত্য চিরকালের জন্য বিলুপ্ত ক'রে দেওয়ার আদর্শের সঙ্গেও মিলে যায়। সুতরাং শুনতে ভালও লাগে, আশাও হয়। হয়তো মুখেও তার আভাস ফুটে ওঠে। সে দেখে হাফিজ বলে, আমাদের জীবন নিয়ে বই লিখুন না দাদা! আপনি পারবেন—আমি জানি, আপনি পারবেন। হিন্দুসমাজে ধনী, জমিদার, গোঁড়াদের স্বরূপ খুলে দেখিয়ে যেমন লিখছেন, তেমনই ক'রে এদের স্বরূপ খুলে দিতে পারেন?

আমি অবশ্যই অহংকৃত হই। নিবিড় ভাবে আলোচনা চলে হাফিজের সঙ্গে।

এ সেই হাফিজ। হাফিজের মুখ-ফেরানো দেখে লজ্জিত হলাম এবং শঙ্কিতও হলাম। গাড়িতে এখন হিন্দুর সংখ্যাধিক্য। হাফিজ শঙ্কিত হচ্ছে, পাছে আমি—। আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু গাড়িখানার যাত্রী অধিকাংশই বর্ধমানের এদিকের লোক। তার পর? হাফিজ আমার চেয়ে অনেক বলিষ্ঠ।

তাকালাম জানলার বাইরের দিকে।

প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে গিয়েছে সম্প্রতি। মাঠ থৈ-থৈ করছে। ঘন সবুজে চারি দিক ভ'রে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে দেখা যাচ্ছে। বর্ষা নাবি, চাষ সন্ত শেষ হয়েছে, কোথাও কোথাও এখনও চলছে। লাইনের পাশের ঝোপগুলি অবশ্য বরাবরই গাঢ় সবুজ, লতায় লতায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। আলোক-লতাগুলি চাপ বেঁধে জ'মে উঠেছে। কতকগুলিতে অজস্র ফুল ফুটেছে। টেলিগ্রাফের তারের উপর চিরকালের মতই ফিঙে ব'সে পুচ্ছ নাচাচ্ছে।

গাড়ির মধ্যে আলোচনা দাঙ্গা থেকে বিচিত্র গতিতে হোমিওপ্যাথিতে এসে পৌছেছে। নার্ভাস শক খেয়ে যারা অসুস্থ, তাদের জন্য এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথি অমোঘ, এমন কি বলের মধ্যে মহাবল—দৈববলের চেয়েও কার্যকরী এবং ফলপ্রদ। এই সেতু অবলম্বন ক'রেই দাঙ্গা থেকে হোমিও-প্যাথিতে এসে পড়েছে আলোচনা। তার পর হোমিওপ্যাথি-জগতের আঁকে-বাঁকে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে। নার্ভাস শকে অসুস্থতার কথা উঠেছে হাফিজের স্ত্রীকে দেখে। মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন বোবা হয়ে গিয়েছে, পঙ্গু হয়ে গিয়েছে, নীরব মাটির পুতুলের মত নিষ্পলক বিচিত্র দৃষ্টিতে যেন আঁকা চোখে চেয়ে রয়েছে সামনের জানলার দিকে ; ছেলেটিকে বুকে চেপে ধ'রে রয়েছে, মুখে অসঙ্কোচে দিয়েছে স্তনবৃন্ত। বুঝলাম, ছেলেটিকে কোন রকমে সে কাঁদতে দিতে চায় না কেন। সম্ভবত মায়ের আশঙ্কা—শিশুর কণ্ঠস্বরেও হয়তো ভাষাগত ভিন্নতার পরিচয়ের মত কোন সূক্ষ্ম পার্থক্যের পরিচয় ধরা প'ড়ে যাবে।

কলকাতা থেকে খানিকটা দূরে এসে মনটা যেন খানিকটা সহজ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অবসর পেয়ে পেশাগত দৃষ্টিতে মানুষকে দেখে এবং মনে মনে হাফিজকে বিশ্লেষণ ক'রে বুদ্ধির তুলিতে অতি-আধুনিক টেক্‌নিকে তার একখানি পোর্ট্রেট এঁকে বেশ একটু নেশা-ধরানো আত্ম-প্রসাদও লাভ করেছি। এতক্ষণে একটা সিগারেট ধরালাম। এই সময়টিতে হাফিজ আবার তাকালে আমার দিকে চকিত দৃষ্টিতে। মধ্যে মধ্যে চোরা-দৃষ্টিতে সে আমাকে নিশ্চয় লক্ষ্য করছিল। আমি হেসে উঠে দাঁড়িয়ে একটি সিগারেট বাড়িয়ে দিলাম। ঝুঁকে হাত বাড়ালে ভিড় সত্ত্বেও তার হাত পৌঁছুবার কথা। সেও হেসে হাত জোড় ক'রে সবিনয়ে নমস্কার ক'রে বললে, না।

মনটা আবার বিষণ্ণ হ'ল।

*   *   *

বর্ধমানে গাড়ি প্রায় খালি হয়ে গেল। হাফিজ আমার পাশে এসে ব'সে বললে, কিছু মনে করেন নি তো দাদা ?

কি মনে করব ? আর, কিছু মনে করবার হেতুই বা কি ?

কথা বলি নি।

জানি, আমাকে বিশ্বাস কর নি।

না। সাহস করি নি। আমাদের উচ্চারণে—

বাধা দিয়ে বললাম, এক-একবার সেও মনে হয়েছিল।

আর সিগারেট নিই নি, উপবাস ক'রে রয়েছি।

ও, রোজা।

হ্যাঁ।—হাসলে হাফিজ। তারপর অকস্মাৎ বললে, এ কি হ'ল দাদা ? কেন হ'ল ?

প্রশ্নটির মধ্যে এমন কিছু ছিল, যার জন্যে মুহূর্তে আমার চোখে জল

এসে গেল। টপ টপ ক'রে ঝ'রে পড়ল জল চোখ থেকে, মুছে গোপন করবার চেষ্টা করলাম না। দেখলাম, হাফিজের চোখেও জল টলমল করছে। এর পর একটা আলোচনা জ'মে উঠাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু হৃদয় যখন অতিমাত্রায় ভারাক্রান্ত হয়, তখন বুদ্ধিবৃত্তিগত প্রগল্‌ভতার দিকটা অত্যন্ত লঘু হয়ে যায়, কোন মতেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের কবলগত মনকে এতটুকু নাড়া দিতে পারে না।

সন্ধ্যার একটু আগে গন্তব্য স্টেশনে পৌছলাম। দুজনেরই এক স্টেশন। এখান থেকে ব্রাঞ্চ-লাইনে দুজনকেই যেতে হবে। নেমে দেখলাম, ব্রাঞ্চ-লাইনের ট্রেন দশ মিনিট আগে চ'লে গিয়েছে। এতক্ষণে ঘড়ি দেখতে খেয়াল হ'ল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সময় দেখে ব্রাঞ্চ-লাইনের ট্রেন ছাড়বার সময় হিসেব ক'রে উৎকণ্ঠা ভোগের হাত থেকে বেঁচেছি। কথাটা বলতে হাফিজ হাসলে। নিজের ঘড়িটায় দেখে পশ্চিমের দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বললে, দাঁড়ান দাদা, রোজা খুলবার সময় হয়েছে, সময়ও পাওয়া গেছে। নামাজ সেরে নি ধীরে-সুস্থে। খোদাতায়লাকে আল্লারসুলকে প্রাণ ভ'রে ডাকি। বড় বেঁচে এসেছি।

আমি স্টেশনে পায়চারি করতে করতে ভাবলাম, আমিও ডাকব না কি আমার ঈশ্বরকে?

পরমুহূর্তেই মনে হ'ল, প্রশ্ন যেখানে জাগছে, সেখানে দ্বিধার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহ। সন্দেহ যেখানে, সেখানে তিনি নাই—সে কথা তাঁর নাকি স্বমুখের উক্তি। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে বাঙালী হিন্দুর—শিক্ষিত হিন্দুর ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন—সমস্যা সেইটা বড় নয়, তার চেয়ে সামনে পনরো ঘণ্টা বেকার আটক অবস্থা অনেক বড় সমস্যা। রাত্রি আসছে। দাঁড়াবার স্থানের অবশ্য অভাব নাই, কিন্তু শোব কোথায়? ওয়েটিং-রুমের অভিজ্ঞতা আছে, কিছু দিন পূর্বে এক রাত্রের কথা মনে পড়ল—সমস্ত রাত্রি ছারপোকার দৌরাত্ম্যে দাপাদাপি করতে হয়েছিল।

অন্য এক ভদ্রলোককে বাক্স থেকে নতুন কাপড় জামা হাতে ছুটে মাঠে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলাম, সেখানে গিয়ে কাপড় ছেড়ে এসে বাকি রাত্রিটা প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের উপর ব'সে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। এখন মাস ভাদ্র হ'লেও ভরা বর্ষা ; প্ল্যাটফর্মে কাদা জ'মে রয়েছে, আকাশে মেঘ রয়েছে এবং যেন ঘনাচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছে। সুতরাং উপায় কি ? বড় লাইনের প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে স্টেশনটার বাজারের দিকে এগিয়ে গেলাম।

বাবু! বাবু মাশায়!

বটগাছতলায় গরুর গাড়ির আড্ডা থেকে ডাকলে একজন গাড়োয়ান।

গাড়ি চাই বাবা ?

গাড়ি ?

আজ্ঞে হঁ্যা। কোথাও যেন যাবেন মনে লিছে!

লোকটির চোখের রঙ ঘোলাটে, দৃষ্টির ভঙ্গি নির্বোধ ব'লে মনে হয়, কিন্তু পেশাগত শিক্ষায় যাত্রী চেনে দেখলাম নির্ভুল। সেই জন্যই হাসলাম একটু। সে এগিয়ে এল, বললে, হাল্কা গাড়ি, নতুন গরু, হন হন ক'রে নিয়ে যাব বাবু। কোথা যাবেন হুজুর ?

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মেঘ কাটছে। চারি পাশে মেঘ থাকলেও মধ্য আকাশ নির্মেঘ—বর্ষণ-ধৌত ভাদ্রের গাঢ় নীল আকাশ ঝলমল করছে। সারা রাত্রি এখানে দুর্ভোগ করার চেয়ে গরুর গাড়িতে রওনা হওয়া অনেক ভাল। গাড়িটা হাল্কা কি না পরীক্ষা করতে লজ্জা বোধ হ'ল। গরু দুটির দিকে চেয়ে দেখলাম, অতিকায় ছাগল দুটি। তবে হঁ্যা, নতুন যৌবন বটে। ছোট পায়ে 'খরখর' হাঁটলে ঘণ্টায় দু মাইল না পারুক—দেড় মাইল হাঁটবেই। সাত মাইল পাঁচ ঘণ্টা যথেষ্ট। বাজছে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম—সওয়া ছটা, সওয়া এগারোটা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত পৌছব বাড়ি। ভাড়া করতে গিয়ে মনে হ'ল হাফেজের কথা। হাফেজকে ফেলে যাওয়াটা অন্তত আজ যেন অন্যায় হবে ব'লে মনে হ'ল।

লোকটি বললে, বাবু ?

আমি বললাম, আর গাড়ি দিতে পার ? অন্তত আর একখানা ?

কজন আছেন আপনারা।

লোক বেশি না, তিন জন। তবে দুখানা গাড়ির কম হবে না।

আমি দেখছি বাবু।

দেখ। আমিও আসছি। ছোট লাইনের স্টেশনে রয়েছি আমরা।

ব্রাঞ্চ-লাইনের স্টেশনে এলাম। হাফিজ এবং তার পত্নী-পুত্রকে সঙ্গে নিয়েই যাব। রাত্রে নিজের বাড়িতে আপন জনের মত রাখব—এই সংকল্প ক'রেই আর একখানা গাড়ির জন্য বলেছি। পরদিন সকালে হাফিজ চ'লে যাবে নিজের গ্রামে। আমাদের গ্রাম থেকে তার গ্রাম আরও মাইল ছয়েক দূর। ব্রাঞ্চ-লাইনে আমাদের গ্রামের স্টেশনে নেমেই তাকে যেতে হয়; সুতরাং অসুবিধা কিছু হবে না।

ব্রাঞ্চ-লাইনের স্টেশনে এসে দেখলাম, হাফিজ নামাজ সেরে এরই মধ্যে বেশ আসর জাঁকিয়ে ব'সে গিয়েছে। বেশ একটি দল মুসলমান স্টেশনের মুসাফেরখানার একটা দিক দখল ক'রে ব'সে গল্প করছে। অন্য দিকে বসেছে এক দল হিন্দু। সংখ্যার তারতম্য খুব বেশি নয়। তবে উত্তেজনাটা মুসলমানদের মধ্যে বেশি, এ কথা সত্য। হাফিজ মাঝখানে বসেছে। একটু স্বতন্ত্র ভাবে বসেছে তার স্ত্রী—তার মুখ এবং সর্বাঙ্গ এখন বোরখায় ঢাকা। হাফিজ আমাকে দেখে চুপ ক'রে গেল। কিছু বলছিল সে,—কি বলছিল তা জানি না। সমবেত মুসলমানদের সকলে মামলা ক'রে ফিরছে, ব্রাঞ্চ-লাইনে আমাদের মতই ট্রেন-ফেল-করা যাত্রী, কয়েকজন আমার পরিচিত, দুজন আমার গ্রামের লোক। হিন্দুদের দলেরও অনেকে পরিচিত, তাঁদের একজন সাগ্রহে আমাকে আহ্বান করলেন, আসুন, আসুন।

আমি হাফিজকে ডেকে নিমন্ত্রণ জানালাম। হাফিজ হাতজোড় ক'রে বললে, না দাদা। বেশ কাটিয়ে দেব একটা রাত্রি।

আর কথা না ব'লে ফিরে গিয়ে বসল তার বিছানো শতরঞ্চিটার উপর।

আমি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে ফিরে এলাম গাড়োয়ানের কাছে। পশ্চিম-আকাশে মেঘ কেটে গিয়ে সন্ধ্যার উজ্জ্বলতা দ্বিগুণিত হয়ে ফুটে উঠেছে। গাড়ির সামনেটায় পা দিয়ে কুলিটাকে বললাম, বিছানাটা খুলে বিছিয়ে দাও।

কুলিটা থমকে দাঁড়াল।

কি ?

কুলি বললে, মুসলমানের গাড়িতে যাবেন বাবু ?

মুসলমানের গাড়ি ? ফিরে তাকালাম গাড়োয়ানটির দিকে। নৃতাত্ত্বিক কোন পার্থক্য খুঁজে পেলাম না, দেখলাম, চিরকালের আমাদের দেশের একজন গরুর গাড়ির গাড়োয়ান।

কুলিটি বললে, আমি গাড়ি দেখে দিচ্ছি বাবু। হিন্দুর গাড়ি। ভাল টাপর, ভাল গরু। আধ ঘণ্টা সবুর করেন আপনি।

গাড়োয়ানটি হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রতিবাদ করলে না, মিনতি করলে না, আক্ষেপও করলে না। আমি একবার চোখ বন্ধ করলাম, ভগবানকে ডাকলাম। তারপর কুলিটিকে বললাম, এই গাড়িতেই তুলে দাও বিছানা স্নুটকেস। আন, আন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পূর্বে ভেবেছিলাম, ভগবানকে মানি না। এই মুহূর্তে উপলব্ধি করলাম, বুদ্ধি দিয়ে নয়—হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম, ভগবানকে মানি, অন্তরে অন্তরে মানি ; উপলব্ধি করলাম তাঁর প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব, আমার বুকের মধ্যে তিনি সমাসীন রয়েছেন। নইলে কলকাতা থেকে এইমাত্র এসে এই শেখজীর গাড়িতে চড়লাম কার সাহসে ? শেখ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে করুক, মরবার সময় দোষ দিয়ে মরব না কাউকে। নিজেকেও নির্বোধ আবেগ-পরিচালিত মূর্খ ব'লে বারেকের জন্যও আক্ষেপ করব না, শুধু একবার প্রশ্ন করলাম তাকে, শেখজী, চড়ব তোমার গাড়িতে ?

শেখ বললে, চলুন বাবা। আপনার বাড়ি পৌঁছা দিয়া এর জবাব
়।

*　　*　　*　　*

মন্থরগতিতে চলেছে শেখের গাড়ি।

গাড়ির মধ্যে আমি স্থিরদৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে ব'সে রয়েছি। ধ্য মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি সজাগ হয়ে উঠছে। যা করেছি—সমালোচনা করতে চ্ছ মন। কলকাতার কথাই শুধু নয়। এখানকার অতীত ইতিহাস ন পড়েছে। এই সাত মাইল পথের মধ্যে এই স্টেশন পার হয়ে আর ম নাই। প্রান্তরে প্রান্তরে চ'লে গিয়েছে—খাঁ-খাঁ করা প্রান্তর। মধ্যে াগয়া' নদীর পুলের দু ধারে জঙ্গল, তার পরই সুন্দীপুরের বটতলা। তাব্দী ধ'রে চলেছে নিষ্ঠুর নরহত্যা। ইতিহাসের কথা—আমার রচনা- রা কাহিনী নয়, এ নরহত্যার নায়ক ছিল মুসলমানেরা এবং তাদের কার-সন্ধানের একটা ছদ্মরূপ ছিল—এই ভাড়াটে গরুর গাড়ির ড়োয়ানি। আমারই বাল্যকালের স্মৃতি মনে আছে। গভীর রাত্রে ামাদের গ্রামের পাশ দিয়ে মানুষের নিদ্রিত চেতনাকে আর্ত আহ্বানে াগিয়ে একজন পথিকের প্রাণ-ফাটানো চীৎকার দ্রুত ছুটে গেল— া—ন—বাঁ—চা—ও! জা—ন—বাঁ—চা—ও! জা—ন—বাঁ—চা—ও! ামার সর্বশরীরে কম্পন জেগেছিল সে ধ্বনির আঘাতে, বুকের মধ্যে ান্না-বিজড়িত প্রতিধ্বনি জেগেছিল ওই ধ্বনির—বাঁচাও—বাঁচাও—ওকে াচাও। মনে আছে, দেখতে দেখতে গ্রাম মানুষের সাড়া ভ'রে ঠেছিল; সেই সাড়ায় সাহস পেয়ে ছাদে উঠেছিলাম, ছাদ থেকে দেখেছিলাম, গ্রামের দক্ষিণে—প্রান্তরে, যে প্রান্তরটার মধ্য দিয়ে চ'লে গয়েছে এই সড়কটা, সেখানে আলো আর আলো। কোথায়—কই? ভয় নাই—ভয় নাই—শব্দে আকাশ ভ'রে উঠল। কিন্তু কোথাও গউকে খুঁজে পাওয়া যায় নাই। পরদিন পাওয়া গেল এক মুসলমানের

শবদেহ—নদীর ধারের একটা ঝোপের মধ্যে। প্রকাশ পেল, মুসলমানটি বিদেশী, এসেছিল এখানকার এক বিখ্যাত গরুর হাটে গরু কিনবার জন্য। এই স্টেশনেই এমনি এক মুসলমান গাড়োয়ান তাকে নিজের গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে আসে। পথে সুন্দীপুরের বটতলা—বহুকাণ্ডময় অন্ধকার ভয়াবহ বটতলা বহু কাল থেকে এই নরঘাতকদের গুপ্ত আশ্রয়—এইখানটিতে গাড়োয়ানের সঙ্কেতমত তারা বেরিয়ে এসে বিদেশীকে আক্রমণ করে। কিন্তু বিদেশী ছিল শক্তিশালী, সে ব্যূহ ভেদ ক'রে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। বিভ্রান্ত বিদেশী, সড়কের পাশের গ্রাম দেখেও প্রবেশ করে নাই, হয় বিশ্বাস করে নাই অথবা রাত্রে গ্রামের পাশের গাছপালা দেখে নিবিড়তর জঙ্গল ভেবে সাহস পায় নাই। প্রান্তরে—প্রান্তরে—দূরান্তরে—পৃথিবীর কোথায় আছে মানুষের বন্ধু মানুষ, তাদের ডাকতে ডাকতে চলেছিল উদ্‌ভ্রান্তের মত। হঠাৎ সম্মুখে এল নদী, গতি রুদ্ধ হ'ল তার। তারপর—তারপর আর কি!

তার পরের কথা মনে ক'রে আমার বুদ্ধিবৃত্তি হৃদয়াবেগকে তিরস্কার করতে চাচ্ছে। কিন্তু পুষ্পভার-মন্থর তরুর মত আবেশপূর্ণ হৃদয় আমার তিরস্কারের ঝড়ে মিশিয়ে দিলে তার গন্ধ। বালি-ধূলো এসে লাগল—দু-চারটি পাপড়িও হয়তো ছিন্ন হ'ল, কিন্তু আপন ধর্ম থেকে বিচ্যুত হ'ল না সে। খুলেই বলি—নিজেকে তিরস্কার করতে করতে হঠাৎ তিরস্কার করতে আর ভাল লাগল না। নিজের প্রতিবিম্ব দেখি নাই, তবু এ কথা নিশ্চয় যে, আমার মুখে হাসি ফুটে উঠল; মনে হ'ল, ভয় পাচ্ছ কেন? মৃত্যু তো আসবেই একদিন, রোগে ভুগে অসহায়ের মত মরার চেয়ে যুদ্ধ ক'রে মরবার সুযোগ পাবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমানেরাও তো এ মৃত্যুর গৌরব অস্বীকার করে নাই। এর পর নিজেকেই একটু শ্লেষ ক'রেই যেন মনে হ'ল, তবে হ্যাঁ, যে পর্যন্ত এসেছে, এর পর ক্ষান্ত হ'লে নিশ্চিন্তরূপে একটা গল্প লেখার সুযোগ পাবে। এখনও লোকালয় পার হয়ে বেশি দূর

আসে নাই গাড়ি। কোন অজুহাতে গাড়ি ফিরিয়ে নিরাপদে স্টেশনে গিয়ে খাতা-কলম নিয়ে বসলে রাত্রিটা পরমানন্দে কেটে যাবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বাণী প্রচার করতে চাইলে—তাও হবে। হিন্দুর মহত্ত্ব দেখাতে চাও, তারও পথ আছে। মুসলমানের মহত্ত্ব দেখাতে চাও, তারও রয়েছে চমৎকার স্থযোগ। হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রিত এক ডাকাত এনে হাজির কর—তারপর তোমরা দুজনে আত্মরক্ষার পরিবর্তে পরস্পরকে রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা কর, দুজনেই মরতে চাও, না, আহত হয়ে বাঁচতে চাও বাঁচ। বিদেশী ইতিহাসের ভাবের ঘরে চৌর্যবৃত্তি ক'রে এমনও করতে পার—আহত অবস্থায় একজনের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য অন্য জন আহত অবস্থায় জল আনতে গিয়ে সেই জলের ঘাটে মুখ থুবড়ে প'ড়ে আর উঠতে পারলে না। অথবা হিন্দু আক্রমণকারী এক দলকে এনে হাজির কর—এই কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির মূক মশালের লাল আলোয় রাঙিয়ে, তারপর তাদের দিয়ে আক্রমণ করাও গাড়োয়ানকে—তুমি রক্ষা কর তাকে, একটি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দাও, অথবা ওকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের রক্ত দাও, তারই ফলে হিন্দুদের চৈতন্য এনে দাও। অথবা নিয়ে এস মুসলমান আক্রমণকারীর দল। বিপরীতটা ঘটাও। জ'মে যাবে, নিঃসন্দেহে জ'মে যাবে গল্প।

জয় গৌর রাধেশ্যাম! প্রভু, চলেছেন দেখছি।

কে ?

পথের পাশ থেকে সামনে এল আমার অতি-পরিচিত বাউল বুড়ো নিতাই দাস; লোকে বলে—জয়-গৌর বাবাজী।

বাবাজী ?

বাবাজী এখন আপনি প্রভু, আমি এখন ছেলেজীর দলে। বাড়ি চলেছেন? ছোট লাইনের টেন বুঝি ধরতে পারে নাই বড় লাইনের গাড়ি ?

না। কিন্তু—

কথা বলবার আগেই বাউল গান ধ'রে দিলে—

'জ্ঞান-বুদ্ধির বড় লাইন গিয়েছে হেরে—

ভক্তিপথের ছোট গাড়ি হায় রে আগে দিয়েছে ছেড়ে।

আমার নিতাইচাঁদের ডেরাইবারির—কি কারিগরি—

মরি রে মরি! হায় তামাশায় হেসে যে মরি!

বাবাজী বড় ভাল গায়। বুড়ো হয়েছে, তবু গলার মিষ্টত্ব এবং শক্তি দুইই এখনও চমৎকার। মনের এই অবস্থায় বাউলের গান বড় ভাল লাগল। আমি স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম। শুধু তাই নয়, বাবাজীকে সঙ্গে পেয়ে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, যা চেয়েছিলে তা পেয়েছ—দোসর। পরক্ষণেই বুদ্ধি সজাগ হয়ে উঠল, আমার নীচের ঠোঁটটা বেঁকে গেল আপনা থেকে—হ্যাঁ, দোসর বটে! চমৎকার দোসর! বন্যার মধ্যে তৃণ বলতে পার, প্রলয় বর্ষণে পাতার আচ্ছাদন বলতে পার। বাউল মনের আনন্দে গান গেয়ে চলল। লাইনগুলি সব মনে ধরা পড়বার মত নয়, আধুনিক যুগের ভাষা ও ছন্দবিন্যাসের সঙ্গে মিল নাই; ভাষাও দুষ্ট এবং ছন্দ কষ্টক্লিষ্ট। ভাবটা সহজ এবং গ্রাম্য, উপমাগুলি বিচিত্র। জ্ঞান-বুদ্ধির বড় লাইনের গাড়ির আগেই চ'লে গেল ভক্তি-পথের ছোট লাইনের গাড়ি। নিতাইচাঁদ ছোট গাড়ির ড্রাইভার। আশ্চর্য তার কারিগরি। এখন বড় লাইনের যাত্রীরা বৈতরণীর প্ল্যাটফর্মে হাঁ ক'রে ব'সে রয়েছে, সামনে রাত্রি। যেমন কর্ম তেমনই ফল। জ্ঞান-বুদ্ধির বড় লাইনের গাড়ির—সে এক আজব কারখানা, জাঁকালো জাঁকজমক, লাইনের পথও লম্বা—দেশ-দেশান্তর-মুল্লুক জুড়ে। লম্বা পথে গণ্ডগোলও অনেক, 'লাইন কিলিয়ার' থাকে না, সম্পদের মালগাড়ি পথ আগলে থাকে—লেট হতে হয়; তার উপরে যদি ধাক্কা লাগে তো সে ধাক্কা কাটিয়ে ওঠা বিষম দায়। ছোট লাইন তবু ভাল, পথ অল্প—গাড়ি ছোট। লেট হয় না, হ'লেও ক

লেট হয়; মাল-গাড়ি এ রাস্তায় কম; ধাক্কা লাগবার সম্ভাবনা কম, যদিই লাগে, তার ধাক্কা খেয়েও মানুষ বাঁচে। ওর চেয়েও ভাল—বিশ্বাসের গরুর গাড়ি। তার চেয়েও ভাল, সব চেয়ে নিরাপদ—প্রেমের পায়ে-হাঁটার পথ। যদি তোর মনে ধরে পাগলের কথা, তবে যাত্রী মুসাফের রাহীর দল গাড়ি থেকে নেমে এই বাউলের সঙ্গে নেমে পড়্ পথে।

ভারি ভাল লাগল বাবাজীর গান। স্তব্ধ হয়ে দেশের প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইলাম। দেওঘর মধুপুর সাঁওতাল পরগনার মত ভূমি-প্রকৃতি—লাল কাঁকরের অনুর্বর বিস্তীর্ণ বৃক্ষহীন প্রান্তর চ'লে গিয়েছে। রাস্তার উত্তর দিকে চাষের মাঠ। এ দিকে ধান জ'মে উঠতে শুরু করেছে। এখনও সবুজের মধ্যে ঈষৎ হলুদের আভা পাওয়া যায়। সম্ভবত কয়েক দিনের মধ্যেই হলুদের আভা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, সবুজের সঙ্গে কালো রঙের রেশ দেখা দেবে। দূরে দূরে গ্রাম। বনরেখা দেখা যাচ্ছে, ঘন নিবিড় সরস লাবণ্য যেন গলিত হয়ে পড়ছে। চারি দিকটা কিছুক্ষণ আগেও এত ভাল লাগছিল না। বাবাজীর গানের প্রভাব বোধ হয়। হঠাৎ মনে হ'ল, স্টেশনে বাবাজীকে পেলে বড় ভাল হ'ত। হাফিজকে গানটা শুনিয়ে দিতাম। গানটা শুনে সে আমার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে কি না দেখতাম।

বাবাজী কিন্তু গান সম্বন্ধে আমার মতামত শুনবার জন্য উৎসুক, অনেক দিনের পরিচিত লোক—প্রথম যৌবনে ও আমাকে দেখেছে, যৌবনপ্রান্তে উপনীত হয়ে আমাকে যৌবনে পদার্পণ করতে দেখেছে। আমাদের গ্রাম ছিল তখন সমৃদ্ধ—দুটো গোটা পাড়াই ছিল জমিদার-পাড়া; বড় না হোক, স্বল্প আয়ের স্বচ্ছল গৃহস্থের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির সঙ্গে—বিয়ের কনের মাথার মুকুটের মত ছিল জমিদারির গৌরব। শিক্ষাও ঢুকেছে তখন তাদের মধ্যে, চাকরি-ব্যবসাতেও অনেকে মন দিয়েছেন—আমার তখন বেকার অবস্থা। পৈতৃক সম্পত্তি সত্ত্বেও বেকার অবস্থা আরোপের কারণ অবশ্য কংগ্রেসের কাজে ঝোঁক। তার উপর লোকের বিয়ে-সাদিতে

প্রীতি-উপহার রচনা করি। বিজ্ঞজনে বলত, ছোকরা শেষ পর্যন্ত বিক্রমপুরী ব্যবসা করবে। অর্থাৎ পৈতৃক সম্পত্তিটুকু বিক্রি ক'রে উত্তরাধিকারীদের হাতে খালি ভাঁড় দিয়ে যাবে। কবিতা লেখার জন্য বলত—সাধ্যমত কবিতা ক'রেই বলত, 'কবি! শেষ পর্যন্ত হয়ে যাবেন ভবি।' ভবির অর্থ সম্বন্ধে মাথা-ব্যথা তাদের ছিল না, কারণ প্রবাদ বচনে ভবি কখনও ভোলে না, অর্থাৎ সে সুচতুর ব্যক্তি; তাদের লক্ষ্য ছিল মিলের দিকে। সে সমস্তই বাবাজী শুনত, কিন্তু তবু আমাকে সে ভালবাসত। কারণ সে নিজেও গান রচনা করত তখন থেকেই। তার পর সেই আমাকে উত্তরকালে দস্তুরমত একজন লেখক হতে দেখে, এবং সেই গ্রামের মধ্যেই আমার প্রশংসা-বাণী উচ্চারিত হতে শুনে তার কৌতূহল এবং আসক্তি বা স্নেহ দুই আমার প্রতি পূর্বকালের তুলনায় বেড়ে গিয়েছে। সম্ভবত নিশ্চয়ই সেই কারণে সে নিজের গান সম্বন্ধে মতামত শুনবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিল। সে বোধ হয় আমার কাছ থেকে স্বতোৎসারিত প্রশংসা প্রত্যাশা করেছিল। আমাকে স্তব্ধ হয়ে থাকতে দেখে প্রশ্ন করলে, কি বাবা, গান ভাল লাগল না?

ঈষৎ হেসে বললাম, না বাবাজী, খুব ভাল লেগেছে। যেমন গান, তেমনই গাইলে তুমি!

ঐটুকুতেই খুশি বাবাজী, হাসিতে ভ'রে উঠল তার মুখ। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে বললে, গৌরচাঁদের দয়া আর রসিক জনের ভালবাসা বাবা। তাঁর কৃপাতেই ভাব, তাঁর দেওয়া গলাতে গান, রসিক-জনে ভালবাসে, তাই তাঁদের ভাল লাগে আমার মত অভাজনের 'পদ'। তা দেন, কিছু ভিক্ষা দেন।

আমি ব্যাগটা বার করলাম। বাবাজী বললে, উহুঁ, টাকা-পয়সা নয়। সিগারেট দেন।

আমি সিগারেট বার ক'রে বাবাজীর হাতে দিলাম।

বাবাজী বললে, ঘোড়া দিলেন, চাবুক দেন, সেটা আবার কোথায় পাব আমি?—দেশালাই গো প্রভু। আর গাড়োয়ান বাবাকে দিন একটা সিগারেট। আপনি একটা ধরান। নইলে জমবে কেন মহাজন?

আমি হেসে গাড়োয়ানকে সিগারেট দিলাম, নাও শেখ।

শেখজী! তুমি শেখ না কি?

হ্যাঁ বাবাজী। আমি শ্যাখ।

বাবাজী একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে গান ধ'রে দিলে—

শেখ-সৈয়দ আমীর-নবাব ফকির-ঠাকুর-পীর—
বৈরাগীকে পায়ের ধূলা দাও—চরণধূলা।
তোমার খোদা-আল্লাতালায় ব'লো আমার কথা—
মুছিয়ে দিতে আমার মনের মলা—দিলের মলা।

শেখ এবার 'সাবাস সাবাস' ক'রে উঠল। উৎসাহ-ভরে গরু দুটোর পেটে পায়ের বুড়ো আঙুলের টোক্কর দিয়ে পাঁচনটা তুলে বাঁ হাতে একটার পিঠে চাপ দিয়ে নাকে ঘোঁড়ং ক'রে একটা শব্দ ক'রে উঠল।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাসলাম আমি। মিছে কথার মালা গেঁথেছ বাউল। দরবেশ-সাঁইরাও এমনি ধারার হিন্দু ব্রাহ্মণকে বৈষ্ণবকে বন্দনা ক'রে গান রচনা ক'রে গিয়েছে; সত্যপীর সত্যনারায়ণ—সব মিথ্যে। কলকাতার রক্তাক্ত রাজপথের দৃশ্য যে দেখেছে, তার চেয়ে এ কথা কেউ ভাল জানে না।

বাউলের গান শেষ হতেই শেখ বললে, বাবু মাশায়!

কি?

বাবু মাশায়ের কি মহাজনি করা হয়?

মহাজনি?—একটু বিস্মিত হলাম। মহাজনির অর্থ—উত্তমর্ণের ব্যবসা, হাল আমলের বাংলায়—ব্যাঙ্কিং বিজনেস। সবিস্ময়ে শেখকে বললাম, কে বললে তোমাকে?

ওই যে বাবাজী বললে।

বাবাজী ব'লে উঠল, হায় অভাজন, মহাজন মানে জান না? সে তাকে মহাজন মানে বুঝাতে লাগল।

হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত চকিত ক'রে বিদ্যুৎ-ঝলক খেলে গেল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির সন্ধ্যা, বুঝতে পারি নাই, কারও খেয়াল হয় নাই, গানে-কথায় মত্ত ছিলাম, আকাশে আমাদের পিছনে পশ্চিম দিগন্ত ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। পরক্ষণেই গুরুগর্জনে প্রান্তরের বায়ুস্তর কেঁপে উঠল। গরু দুটো ভয়ে ভড়কে গিয়ে গাড়ির জোয়াল ফেলে দড়ি ছিঁড়ে পালাবার জন্য চেষ্টা করল; ব্যর্থ হয়ে মাটিতে মাথা নামিয়ে পা শক্ত ক'রে স্থির হয়ে দাঁড়াল; আর যাবে না তারা।

সনসন ক'রে মেঘ উঠছে—পশ্চিম থেকে বাতাসের জোর ধরেছে, ঠাণ্ডা বাতাস। বাউল চমকে উঠে বললে, গৌর—গৌর—গৌর!

শেখ স্মরণ করলে খোদাতালাকে।

আমি আকাশের দিকে চেয়ে চিন্তিত হলাম। বৃষ্টি অনিবার্য। শেখের গাড়ির টাপর জীর্ণ। আশেপাশে গ্রাম দূরে। অন্ধকারের মধ্যে তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। দেশে কেরোসিনের কণ্ট্রোল, যুদ্ধের বাজার এখনও সমান তেজে চলছে। সমস্ত দেশের মধ্যেই বোধ হয় আলোর শিখা নিবে গিয়েছে। কথাটা মনে হতেই আর একটা কথা মনে এল বিদ্যুৎ-চমকের দীপ্তির পশ্চাতের শব্দধ্বনির মত। মনে হ'ল, এই দেশের স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের সমাধি রচিত হচ্ছে এই রক্তের মসলায়, নিহত মানুষের কঙ্কালের স্তূপ গেঁথে, "শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য! করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য"—এই গানের ও ধ্বনির উপর। রক্তকলুষ গ্লানির ক্লেদ সর্বাঙ্গে মেখে ঘাতকের হিংস্র উল্লাস-চীৎকার সমাধি রচনা করেছে; নবযুগের সংস্কৃতির কেন্দ্র কলকাতার মহানগরীর রাজপথ পর্যন্ত অন্ধকার। সুতরাং আসুক দুর্যোগ। এই তো সত্য। এর মধ্যে

শেখ বার করুক গাড়ির ভিতরে খড়ের তলা থেকে ছোরা, বৈরাগী বৃদ্ধ হ'লেও তুলুক তার হাতের লাঠি; আমারও অস্ত্রের অভাব হবে না, মার্জিতবুদ্ধি শিক্ষিত বাঙালী আমি, অবশ্যই কিছু-না-কিছু আবিষ্কার করতে পারব।

* * *

বিকিনি-প্রবাল-বলয়ে অ্যাটম বম ফেটে রেডিও অ্যাকটিভ মেঘ-বাষ্পের বিরাট পুঞ্জ উঠেছিল। ফ্রান্সের আকাশে নাকি মেঘ দেখা গিয়েছিল। এখানেও সেই মেঘ বা তারই প্রতিক্রিয়ায় মেঘ দেখা দিয়েছে কি না কে জানে? মহা বর্ষণ নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-চমক এবং কঠিন বজ্রবর্ষী মেঘগর্জন। বর্ষার মেঘের ঘনগম্ভীর গুরু গুরু শব্দ, যে শব্দে সত্যিই হৃদয় নাচে—সে শব্দ নয়। আশ্রয় কোথায়? বীরভূমের মাঠ এবং প্রান্তরের বড় গাছও সুদুর্লভ।

গরু দুটো ঊর্ধ্বশ্বাসে খানিকটা ছুটল, তার পর সম্ভবত গাড়ির জোয়াল কাঁধে শক্তির অনুরূপ ছোটা দুঃসাধ্য বুঝে চেষ্টা করলে গাড়িটা ফেলে দিয়ে পালাবার জন্য। তার পর শেখের তাড়নায় আবার মন্থর গমনে চলতে আরম্ভ করলে।

বাবাজী আর গান গাইছে না। সে গরু দুটোর পাশে থেকে যথাসাধ্য তাদের সান্ত্বনার সঙ্গে সদুপদেশ দিচ্ছে :—একা কি তোদেরই কষ্ট রে বাপধনেরা? আমরাও সুখে চলছি—আরামে রয়েছি? গৌর আছেন মাথার উপর। চল্ রে বাবা, চল্। কানাইকে ডাক্—গোবর্ধন পাহাড় মাথার উপর তুলে ধরবে। মানিক—মানিক—মানিক রে আমার, এই তো চাল ঠিক ধরেছিস।

হঠাৎ মনে হ'ল, বিলুপ্ত হয়ে গেলাম প্রলয়ান্ধকারে। দেখা কিছুই যায় না। তবে বর্ষণের রূপ পরিবর্তিত বুঝলাম—পারিপার্শ্বিক বদলেছে, কোন গাছপালার আশ্রয়ের মধ্যে পৌঁছেছি। বর্ষণ-শব্দ দ্বিগুণিত হচ্ছে

উঠেছে, জল পড়ছে বিস্তীর্ণ পল্লবের মাথার উপর। বিচিত্র ধ্বনি সে। গরু দুটো থেমে গেল। শেখ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তাদের আবার চালাবার চেষ্টা করতে এবং বৈরাগী এবার তাদের শুধু উপদেশ না দিয়ে ধাক্কা দিতে লাগল। মনে হ'ল, ভয় পেয়েছে তারা। জলে ভিজে দেহের মত মনও আমার অসাড় হয়ে এসেছিল। তবু জিজ্ঞাসা করলাম, কি হ'ল ?

ভয়ার্ত স্বরে শেখ বললে, সুন্দীপুরের বটতলা।

বৈরাগী গরু দুটোকে ধাক্কা দিয়ে বললে, চল্—চল্—চল্।

এই জঙ্গলটির পর আবার একটা ফাঁকা মাঠ। গরু দুটো হাঁটু গেড়ে বসেছে। এবার কিছুতেই এ আশ্রয় ছেড়ে নড়বে না তারা। আমি বললাম, থাক্। এখানেই দাঁড়াও।

শেখ বললে, না।

বৈরাগী বললে, না।

আমি বললাম, আর এগুলে মারা যেতে হবে। নামাও গাড়ি। টাপরের পিছন দিক দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়লাম আমি। বিদ্যুৎ চমকে উঠল এই সময়ে। সেই আলোয় বহুকাণ্ডবিশিষ্ট বিরাট বটের কেন্দ্রস্থল লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে গেলাম আমি। বৈরাগী আমার হাত চেপে ধরলে।—না।

শেখ বললে, না।

আমি বললাম, এস—এস।

বৈরাগী আমায় টানলে, না।

কেন ?

বিদ্যুৎ চমকে উঠল আবার। চকিত-প্রখর আলোকে দেখলাম, বৈরাগীর চোখে সে এক অমানুষিক দৃষ্টি। আমি তাকে অভয় দেবার জন্যই বললাম, পিস্তল আছে আমার সঙ্গে—ভয় নাই, চোর ডাকাত খুনে থাকে, গুলি করব।

বৈরাগী শিউরে উঠল,—তার হাতের চকিত স্পন্দনে অনুভব করলাম। সে এবার আর্তস্বরে ব'লে উঠল, না—না—না। তারপর বললে, তার চেয়ে গাড়িতেই থাক। গাড়ি এইখানেই রাখছি। গাছতলায় যেয়ো না। তার পর সে সম্ভবত ঊর্ধ্বমুখেই ব'লে উঠল, হে গৌর, রক্ষা কর। হে গুরু, দয়া কর।

গাড়িতেই বসতে হ'ল। তিন জনেই কোনমতে ঢুকে বসলাম। টিনে সিগারেট ছিল, সিগারেট-লাইটারও ছিল। তিন জনেই ধরলাম।

বাবাজী বললে, ওদিক পানে চেয়ো না তুমি বাবা।

বিদ্যুৎ-চমকের মধ্যে সে লক্ষ্য করেছিল, আমি ওই বটগাছে কাণ্ডের তলায় ঘন-পল্লব আচ্ছাদনের দিকেই লক্ষ্য করছি বার বার। লক্ষ্য ক'রে আমি ভয়ের কিছু পাই নাই; এবং অনুমানে যুক্তি দিয়েও ভয়ের কিছু নাই ব'লেই মনে হয়েছে। যদি নরঘাতকেরা থাকে বা থাকত, তবে এই বর্ষণ-মুখর রাত্রে এই গাড়িখানার মধ্যে আবদ্ধ তিনটি মানুষের চেয়ে সহজ শিকার তারা এতক্ষণ ছেড়ে থাকবে কেন? তাদের রীতি তো আমার অজানা নয়, অতর্কিতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে প'ড়ে আক্রমণ করে; কোন গতিকে কেউ ছুটে পালালে পিছন থেকে ছোঁড়ে হাত-দেড়েক বাঁশের ফাবড়া; সেই ফাবড়া গিয়ে পথিকের গায়ে লেগে তাকে ধরাশায়ী ক'রে দেয়। তার পর তারা এসে গলায় বা ঘাড়ে বাঁশ দিয়ে দু জন চেপে ধরে, এক জন ধড়টা দুমড়ে উল্টে দেয়। হত্যার পরে ও বা সন্ধান করে, লোকটার কাছে কি আছে! কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হয়—হত্যা ক'রে পায় শুধু পরনের কাপড়খানা। সুতরাং গাড়ির মধ্যে ব'সে থেকেও যখন এতক্ষণ নিরাপদ রয়েছি, তখন কাণ্ডের তলায় তারা কেউ নাই—এ অনুমান করতে দ্বিধা কোথায়? তা ছাড়া হত্যাকাণ্ডের কথা ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত; আজকের কথা নয়। আগে—চল্লিশ বছর আগে ঘটত এমন

কাণ্ড। তার পর এই চল্লিশ বছরের মধ্যে এমন কাণ্ড ঘটে নাই। তাই বাউলের এই আতঙ্কের হেতু সঠিক বুঝতে পারলাম না আমি। বললাম, কেন? ভয়ের কি আছে? প্রশ্নটা অসমাপ্ত থেকে গেল আপনা হতে, চকিতে মনে হ'ল—সাপের কথা। এই গাছের এমন কাণ্ডটি সাপের বাসের বড় আরামের জায়গা। শিকড়ের তলদেশ থেকে কাণ্ড শাখা প্রশাখা—এ তো সাতমহলা রাজভবন। বাউল আমার হাত চেপে ধ'রে ব'সে ছিল। আমার কথার সে উত্তর দিলে না। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, কি আছে? সাপ?

ভাঙা গলায় শেখ ব'লে উঠল, সাপ না বাবু,—পাপ। পাপ আছে।

পাপ? বিস্ময়ের আর অবধি রইল না আমার।

শেখই বললে, খুন, বাবু খুন।

খুন?

হ্যাঁ, খুন। ওখানে রাত্রে গেলে খুন চাপবে আপনার। যে যাবে, তারই চাপবে।

এতক্ষণে বাবাজী বললে, পাপ—পাপ আছে ওখানে। ফিসফিস ক'রে বললে, সম্ভবত তার ভয় হ'ল—শুনতে পাবে পাপ তার কথা।

পাপ? খুন? বিচিত্র কি! কত শত বৎসরের পুরানো সুন্দীপুরের বটতলা, চারি দিক জঙ্গলের নিবিড় বেষ্টনীতে বেষ্টিত, মাঝখানে বিশাল ঘন পল্লব বিস্তার ক'রে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে—চারি পাশে নেমেছে বিশ-পঁচিশটা ঝুরির কাণ্ড, মাঝখানে তৃণহীন ঝকঝকে এই স্থানটির ইতিহাসে অসংখ্য নরহত্যার ব্যভিচারের কাহিনী। অন্ধকার রাত্রে মানুষ এখানে এসে বসলে প্রথমে হয় ভয়, তার পর ধীরে ধীরে ভয় কেটে গিয়ে মন নিঃশঙ্ক হয়, ওই সব নিষ্ঠুর ইতিহাস মনে প'ড়ে প্রবৃত্তিগুলি সজাগ হয়ে ওঠে, তার পর তারা নাচতে থাকে। চোখের দৃষ্টিতে জেগে ওঠে সেই সকল কামনা; তখন পাশে নারী থাকলে ব্যভিচার করতে চায় মানুষ,

পুরুষ থাকলে তাকে হত্যা ক'রে সর্বস্ব অপহরণ করতে চায়। দাহ্য কিছু সামনে থাকলে তাতে আগুন দেবার প্রবৃত্তি নিষ্ঠুর উল্লাসে সংকল্পে সম্বদ্ধ হয়; এতে বিস্ময়ের কিছু নাই। যতক্ষণ, তুমি পথিক, এই সুন্দীপুরের বটতলাকে পাশে রেখে অতিক্রম ক'রে যাবে, ততক্ষণ তোমাকে অভিভূত করবে, আতঙ্কে আকুল করবে, নিহত পথিকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ভয় যন্ত্রণা, কিন্তু ওখানে আশ্রয় নিয়ে ওখানকার আক্রমণ-আশঙ্কা থেকে মুক্ত হ'লেই মন বিপরীত উল্লাসে উল্লসিত হয়ে উঠবে।

আমি একটু ভেবে বললাম, ভগবানের নাম করতে করতে চল না বাবাজী। তুমি কর হরিনাম, শেখ তুমি বল নামাজের বয়েং—লা এলাহি ইল্লাল্লা মহম্মদে রসুলাল্লা, আমি আমার ইষ্টমন্ত্র জপ করি, তা হ'লে কি আর পাপ আক্রমণ করতে পারে? এমনই ভাবে আর তো থাকা যায় না। গাছতলায় জল-বাতাস অনেক কম।

বাবাজী বললে, না। শোন তবে। এখানে সুন্দীপুরে নিতাই-গৌরের আখড়া আছে জান তো—সেই মহাপ্রভুর আমলে?

জানি।

সেই আমলের কথা। মহাপ্রভুর একজন দাস—মহা ভক্ত, তিনিই পাপকে এই গাছের মধ্যে বন্দী ক'রে রেখে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। সিদ্ধ হবার আগে পাপ এল তাঁর দেহ থেকে বেরিয়ে। বললে, আমি যাব কোথায়? তিনি বললেন, তুমি কে? পাপ বললে, আমি তোমার আদিপুরুষ থেকে আরম্ভ ক'রে তুমি পর্যন্ত তোমাদের দেহে বাস করছি। আজ তুমি তপস্যা-বলে সিদ্ধ হবে। তোমার মধ্যে আর আমি থাকতে পাব না। তুমি সিদ্ধপুরুষ, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি, আমি যাই কোথায়? সিদ্ধপুরুষ তাকে সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রবলে বন্দী করলেন। বন্দী ক'রে এই বটগাছের কোটরের মধ্যে রেখে দিয়ে বললেন, এইখানে থাক তুমি; তিলে তিলে শুকিয়ে মর। তপস্যা পূর্ণ হ'ল—মহাপ্রভুর দয়া

এলেন সিদ্ধিরূপ ধ'রে, এসেই বললেন, করলে কি? ওকে মুক্তি দিলে না? মুক্তি না দিয়ে বেঁধে রাখলে? ওকে হিংসা করলে? ওর হাতেই দিয়ে রাখলে তোমার মৃত্যুবাণ?

তার পর?

হ'লও তাই। সিদ্ধপুরুষকে একদিন কে এই গাছের কোটরেই মেরে রেখে গেল। কেউ বলে, তিনি এসে ব'সে ছিলেন এই গাছতলায়, সঙ্গে ছিল তাঁর প্রধান শিষ্য। শিষ্যকে দিয়ে পাপ মহাপুরুষকে খুন করালে। কেউ বলে, মহাপুরুষ একাই ব'সে ছিলেন। সেই সময় আসে এক ধনীর পালকি, তার সঙ্গে ছিল পরমাসুন্দরী স্ত্রী—গায়ে এক গা গহনা। মহাপুরুষের পিছনে ব'সে ছিল পাপ—তার ছোঁয়াচে তিনি সেই সুন্দরী মেয়েটির দিকে খারাপ ভাবে চেয়েছিলেন। ওদিকে ধনীর বুকে পাপ ঢুকে ব'সে তাকে ক্ষেপিয়ে দিলে; ধনী তাঁকে খুন ক'রে গাছের ভিতরে ফেলে দিয়ে পালকি হাঁকিয়ে চ'লে গেল। জান, মহাপুরুষকে যে দিন পাপ খুন করিয়েছিল, তাঁকে হারিয়েছিল, সেই দিনের তিথি-নক্ষত্র-রাশি-বার যে বৎসর মিলে যায়, সেই ক্ষণটি যে বার সে পায়, সে বার পাপ এ অঞ্চলে রাজা হয়ে বসে। সে বার দাঙ্গা-খুন-জখম-আগুন—এ সব হবেই এ মুল্লুকে, মানে পাঁচখানা গ্রাম নিয়ে। মহাপুরুষের সিদ্ধির ফল আবার তাকে বন্দী করে। অন্য সময় এই গাছতলাই তার এলাকা। কত শত বৎসর ধ'রে এখানে যারা আসে তাদের দিয়ে সে পাপ করাচ্ছে। আমি একদিন ব'সে ছিলাম কিছুক্ষণ—একদিন দুপুরবেলা। আমার মাথায় খুন চাপল, কেউ ছিল না, গাছের গুঁড়িতে ব'সে ছিল—সুন্দর একটি প্রজাপতি, বলব কি বাবা, আমি হঠাৎ উঠে এক চড় মারলাম, প্রজাপতিটা সেঁটে পিষে গেল গাছের গুঁড়ির সঙ্গে।

হঠাৎ মনে হ'ল, গরম কি পড়ল আমার হাতের উপর। বাবাজীই আমার হাত ধ'রে ব'সে ছিল, আমি বুঝলাম, বাবাজীর চোখের জল। স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর বাবাজী বললে, একটি উপায় আছে। ওখানে বসতে পারে মানুষ, পাপ তাকে আক্রমণ করতে পারে না, যদি ভগবানকে উদ্দেশ ক'রে কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষী সকলকে শুনিয়ে—নিজের পাপের কথা বলতে পারে অকপটে। সব চেয়ে বড় পাপের কথা। পারবে বলতে? শেখ?

শেখ বললে, পারব।

বাবা?

আমি চুপ ক'রে থাকলাম, উত্তর দিলাম না। তা কি পারি আমি? আমি মিথ্যাচারী—দারিদ্র্যের কাহিনী রচনা ক'রে অর্থ উপার্জন করি, সে কাহিনীর মধ্যেও সত্যকে অনেক ক্ষেত্রে গোপন করি, দরিদ্রকে মিথ্যা ভালবাসার ভাণ করি, মিথ্যা আমি ঘোষণা করি—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলকেই আমি সমান চোখে দেখি। আমি কাপুরুষ, বীর্যের কাহিনী রচনা করি, নিজের দুর্বলতা-ভীরুতাকে গোপন করবার জন্য। আমার দম্ভ আছে, কৃত্রিম বিনয় প্রকাশ ক'রে সে দম্ভকে আমি মহিমান্বিত রূপে সাজিয়ে প্রকাশ করি। কলকাতার এত বড় হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কাপুরুষের মত ঘরে ব'সে শুধু অনুশোচনা করেছি, কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছি, আর্তকে রক্ষার জন্য, উন্মত্তকে প্রকৃতিস্থ করবার জন্য কিছু করতে পারি নাই—প্রতিষ্ঠা-হানির ভয়ে, নিজের প্রাণের মমতায়। আরও অনেক—অনেক পাপ। সে সব কথা কি এদের সামনে প্রকাশ করতে পারি?

পারি না।

নতুন সিগারেট ধরিয়ে নীরবে ব'সেই রইলাম গাড়ির মধ্যে।

বিচ্ছিন্ন চিন্তা আসতে লাগল। যামিনী রায়, নির্মল বোস, পশুপতি ভটচাজ, সুবল বাঁড়ুজ্জে, সজনী দাস—নিজের পাপকে কি কেউ অকপটে প্রকাশ করতে পারত এদের সম্মুখে?

কলকাতার মধ্যে কোথাও কি আছে এমন স্বন্দীপুরের বটতলা ?

এবার কি সেই লগ্নক্ষণ এসেছিল কলকাতায় ?

কলকাতার প্রতি লোকটি কি অকপটে আপন পাপ ব্যক্ত করতে পারে ? দেখা ঘটনার বিবৃতি নয়, আপন মনের পাপ ?

হিন্দু-মুসলমান সকলে ? সাধারণ থেকে নেতারা পর্যন্ত প্রতিটি জন ?

পারে না।

তবে কি ভরসা নাই ?

আছে বইকি। আগামী কালে—কোনদিন-না-কোনদিন মানুষ অকপটে নিজের পাপ স্বীকার করতে অবশ্যই পারবে।

বৃষ্টিটা ক'মে আসছে। আকাশে মেঘের আড়ালে চাঁদ উঠেছে। চারি-দিক একটু পরিষ্কার দেখাচ্ছে মেঘ সত্ত্বেও।